Barcode - 4990010223083
Title - Shantiniketan Ed.15
Subject - PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY
Author - Tagore, Rabindranath
Language - bengali
Pages - 106
Publication Year - 1916
Creator - Fast DLI Downloader
https://github.com/cancerian0684/dli-downloader
Barcode EAN.UCC-13
4 990010 223083

[illegible]

([illegible])

[illegible] ঠাকুর

[illegible]

[illegible]

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—

ইণ্ডিয়ান্ প্রেস,—এলাহাবাদ

ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস্

২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এলাহাবাদ—ইণ্ডিয়ান্ প্রেস হইতে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসুর দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সূচীপত্র

পিতার বোধ	...	...	১
সৃষ্টির অধিকার	...	...	৩৫
ছোট ও বড়	...	...	৫৪

শান্তিনিকেতন

পিতার বোধ

যা প্রাণের জিনিষ তাকে প্রথার জিনিস করে তোলার যে কত বড় লোকসান সে কথা ত প্রতিদিন মনে পড়ে না। কিন্তু আপনার ক্ষুধাতৃষ্ণাকে ত ফাঁকি দিয়ে সারিনে; অন্ন-জলকে ত সত্যকারই অন্নজলের মত ব্যবহার করে থাকি; কেবল আমার ভিতরকার এই যে মানুষটি, ধনে যাকে ধনী করে না, খ্যাতি-প্রতিপত্তি যার ললাটে কোনো চিহ্ন দিতে পারে না, সংসারের ছায়ারৌদ্রপাতে যার ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নির্ভর করে না—সেই আমার অন্তরতম

চিরকালের মানুষটিকে দিনের পর দিন বস্তু না দিয়ে কেবল নাম দিয়ে বঞ্চনা করি, তাকে আমার মন না দিয়ে কেবল মন্ত্র দিয়েই কাজ চালাতে থাকি। সে যা চায় তা নাকি সকলের চেয়ে বড়, এই জন্যে সকলের চেয়ে শূন্য দিয়ে তাকে থামিয়ে রেখে অন্য সমস্ত প্রয়োজন সারবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে বেড়াই।

আমাদের এই বাইরের মানুষের, এই সংসারের মানুষের সঙ্গে সেই আমাদের অন্তরের মানুষের একটা মস্ত তফাৎ হচ্ছে এই যে, এই বাইরের লোকটাকে আমরা আদর করে বা অবজ্ঞা করে উপহারই দিই আর ভিক্ষাই দিই না কেন সে সেটা পায়—আর সত্যকার ইচ্ছার সঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে যা না দিই সে আমার সেই অন্তরের মানুষটির কাছে গিয়েও পৌঁছে না।

সেই জন্যে দানের সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলে, "শ্রদ্ধয়া দেয়ম্"—শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করবে। কেন না, মানুষের বাহিরে ভিতরে দুই বিভাগ আছে,

একটা বিভাগে অর্থ এসে পড়ে আর একটা বিভাগে শ্রদ্ধা গিয়ে পৌঁছয়। এইজন্য শ্রদ্ধা যদি না দিই, শুধু টাকাই দিই তাহলে মানুষের অন্তরাত্মাকে কিছুই দেওয়া হয় না, এমন কি, তাকে অপমানই করা হয়। তেমন দান কখনই সম্পূর্ণ দান নয়—সুতরাং সে দান সংসারের দান হতে পারে কিন্তু সে দান ধর্ম্মের দান হতেই পারে না। দান যে আমরা কেবল পরকেই দিয়ে থাকি তা ত নয়।

বস্তুত, প্রতি মুহূর্ত্তেই আমরা নিজেকে নিজের কাছে দান করচি—সেই দানের দ্বারাই আমাদের প্রকাশ। সকলেই জানেন, প্রতি মুহূর্ত্তেই আমরা আপনার মধ্যে আপনাকে দাহ করচি—সেই দাহ করাটাই আমাদের প্রাণক্রিয়া। এমনি করে আপনার কাছে আপনাকে সেই আহুতি দান যখনি বন্ধ হয়ে যাবে তখনি প্রাণের আগুন আর জ্বলবে না, জীবনের প্রকাশ শেষ হয়ে যাবে। এই রকম

মননক্রিয়াতেও নানাপ্রকার ক্ষয়ের মধ্যে দিয়েই চিন্তাকে জাগাতে হয়। এইজন্যে নিজের প্রকাশকে জাগ্রত রাখতে আমরা অহরহ আপনার মধ্যে আপনার একটি যজ্ঞ করে আপনাকে যত পারচি ততই দান করচি। সেই দানের সম্পূর্ণতার উপরেই আমাদের প্রকাশের সম্পূর্ণতা।

বাতি আপনাকে আপনি যে পরিমাণে দান করবে সেই পরিমাণে তার আলোক উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। যে পরিমাণে নিজের প্রতি তার দানের উপকরণ বিশুদ্ধ হবে সেই পরিমাণে তার শিখা ধূমশূন্য হতে থাকবে। নিজের প্রকাশযজ্ঞে আমাদের যে নিরন্তর দান সে সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই খাটে।

সে দান ত আমাদের চলচেই, কিন্তু কি দান করচি এবং সেটা পৌঁচচ্ছে কোন্‌খানে সে ত আমাদের দেখতে হবে। সারাদিন খেটেখুটে বাইরের জিনিস কুড়িয়েবাড়িয়ে যা

কিছু পাচ্চি সে আমরা কার হাতে এনে জমা করচি? সে ত সমস্তই দেখচি বাইরেই এসে জমচে। টাকাকড়ি ঘরবাড়ি সে ত এই বাইরের মানুষের।

কিন্তু নিজেকে এই যে আমরা দান করচি, এই যে আমার চেষ্টা, এই যে আমার সমস্তই—এ কি পূর্ণদান হচ্চে, শ্রদ্ধার দান হচ্চে, ধর্ম্মের দান হচ্চে? এতে করে আমরা বাড়াচ্চি কিন্তু বড় হতে পারচি কি? এতে করে আমরা সুখ পাচ্চি কিন্তু আনন্দ পাচ্চিনে; এতে করে ত আমাদের প্রকাশ পরিপূর্ণ হতে পারচে না। মানুষ বল্লে যতখানি বোঝায় ততখানি ত ব্যক্ত হয়ে উঠচে না।

কেন এমন হচ্চে? কেন না এই দানে মস্ত একটা অশ্রদ্ধা আছে। এই দানের দ্বারা আমরা নিজেকে প্রতিদিন অশ্রদ্ধা করে চলেছি। আমরা নিজের কাছে যে অর্ঘ্য বহন করে আনচি তার দ্বারাই আমরা স্বীকার করচি যে,

আমার মধ্যে বরণীয় কিছুই নেই। আমাদের যে আত্মপূজা, সে একেবারেই দেবতার পূজা নয়, সে অপদেবতার পূজা—সে অত্যন্ত অবজ্ঞার পূজা। আমাদের যা অপবিত্র তাই দিয়েও আমরা নৈবেদ্যকে ভরিয়ে তুলচি।

নিজেকে যে লোক কেবলি ধন মান জোগাচ্চে সে লোক নিজের সত্যকে কেবলই অবিশ্বাস করচে সে আপনার অন্তরের মানুষকে কেবলি অপমান করচে; তাকে সে কিছুই দিচ্চে না, কিছু দেবার যোগ্যই মনে করচে না। এমনি করে সে নিজেকে কেবল অর্থই দিচ্চে কিন্তু শ্রদ্ধা দিচ্চে না—এবং শ্রদ্ধয়া দেয়ম্ এই উপদেশবাণীটিকে সকলের চেয়ে ব্যর্থ করচে নিজের বেলাতেই।

কিন্তু সত্যকে আমরা হাজার অস্বীকার করলেও সত্যকে ত আমরা বিনাশ করতে পারিনে। আমাদের অন্তরের সত্য মানুষটিকে আমরা যে চিরদিনই কেবল অভুক্ত রেখে

দিচ্ছি, তার দুর্গতি ত কোনো আরামে কোনো আড়ম্বরে চাপা পড়ে না। আমরা যার সেবা করি সে ত আমাদের বাঁচায় না, আমরা যার ভোগের সামগ্রী জুগিয়ে চলি সে ত আমাদের এমন একটি কড়িও ফিরিয়ে দেয় না যাকে আমাদের চিরানন্দপথের সম্বল বলে বুকের কাছে যত্ন করে জমিয়ে রেখে দিতে পারি। আরামের পর্দ্দা ছিন্ন করে ফেলে দুঃখের দিন ত বিনা আহ্বানে আমাদের সুসজ্জিত ঘরের মাঝখানে হঠাৎ এসে দাঁড়ায়, তখন ত বুকের রক্ত দিয়েও তার দাবি নিঃশেষে চুকিয়ে মিটিয়ে দিতে পারি নে; আর অকস্মাৎ বজ্রের মত মৃত্যু এসে আমাদের সংসারের মর্ম্মস্থানের মাঝখানটায় যখন মস্ত একটা ফাঁক রেখে দিয়ে যায় তখন রাশি রাশি ধনজনমান দিয়ে ফাঁক ত কিছুতে ভরিয়ে তুলতে পারিনে। যখন একদিকে ভার চাপতে চাপতে জীবনের সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে যায়, যখন প্রবৃত্তির সঙ্গে

প্রবৃত্তির ঠেকাঠেকি হতে থাকে অবশেষে ভিতরে ভিতরে পাপের উত্তাপ বাড়তে বাড়তে একদিন যখন বিনাশের দাবানল দাউ দাউ করে জলে ওঠে, তখন লোকজন সৈন্য-সামন্ত কাকে ডাকব, যে তার উপরে এক ঘড়াও জল ঢেলে দিতে পারে। মূঢ়, কাকে প্রবল করে তুমি বলী হলে, কাকে ধনদান করে তুমি ধনী হতে পারলে, কাকে প্রতিদিন রক্ষা করে করে তুমি চিরদিনের মত বেঁচে গেলে?

আমাদের অন্তরের সত্য মানুষটি কোন্ আশ্রয়ের জন্যে পথ চেয়ে আছে? আমরা এতদিন ধরে তাকে কোন্ ভরসা দিয়ে এলুম? বাহিরের বৈঠকখানায় আমরা ঝাড় লণ্ঠন খাটিয়ে দিলুম কিন্তু অন্তরের ঘরের কোণটিতে আমরা সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালালুম না। রাত্রি গভীর হল, অন্ধকার নিবিড় হয়ে এল, সেই তার একলা ঘরের নিবিড় অন্ধকারের মাঝখানে

ধূলায় বসে সে যখন কেঁদে উঠল আমরা তখন প্রহরে প্রহরে কি বলে তাকে আশ্বাস দিলুম?

তার সেই মর্ম্মভেদী রোদনে আমাদের নিশীথরাত্রির প্রমোদসভায় যখন ক্ষণে ক্ষণে আমাদের বড়ই ব্যাঘাত করতে লাগল, আমোদের মত্ততার মাঝখানে তার সেই গভীর ক্রন্দন আমাদের নেশাকে যখন ক্ষণে ক্ষণে ছুটিয়ে দেবার উপক্রম করলে তখন আমরা তাকে কোনোমতে থামিয়ে রাখবার জন্যে তার দরজার বাহিরে দাঁড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে তাকে বলে এসেছি, ভয় নেই তোমার, "আমি আছি।" মনে করেছি, এই বুঝি তার সকলের চেয়ে বড় অভয় মন্ত্র যে, "আমি আছি।" নিজের সমস্ত ধনসম্পদ মানমর্য্যাদাকে একটা মমতার সূত্রে জপমালার মত গেঁথে ফেলে তার হাতে দিয়ে বলেছি, এইটেকেই তুমি দিনরাত্রি বারবার করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কেবলি একমনে

জপ করতে থাক আমি, আমি, আমি! আমি সত্য, আমি বড়, আমি প্রিয়।

তাই নিয়ে সে জপচে বটে, আমি, আমি, আমি, কিন্তু তার চোখ দিয়ে জলপড়া আর কিছুতেই থামচে না। তার ভিতরকার এ কোন্ একটা মহাবিষাদ অশ্রুবিন্দুর গুটি ফিরিয়ে ফিরিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই জপে যাচ্চে, না, না, না, নয়, নয়, নয়। কোন্ তাপসিনীর করুণবীণায় এমন উদাসকরা ভৈরবীর সুরে সমস্ত আকাশকে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে তুলচে—ব্যর্থ হল, ব্যর্থ হলরে—সকালবেলাকার আলোক ব্যর্থ হল, রাত্রি বেলাকার স্তব্ধতা ব্যর্থ হল—মায়াকে খুঁজলুম, ছায়াকে পেলুম, কোথাও কিছুই ধরা দিল না।

ওরে মত্ত, কোন্ মাভৈঃ বাণীটির জন্যে আমার এই অন্তরের একলা মানুষ এমন উৎকণ্ঠিত হয়ে কান পেতে রয়েছে? সে হচ্চে চিরদিনের সেই সত্য বাণী, পিতা নোঽসি—পিতা তুমিই আছ।

তুমি আছ পিতা, তুমি আছ—আমাদের পিতা তুমি আছ—এই বাণীতেই সমস্ত শূন্য ভরে গেল, সমস্ত ভার সরে গেল, কোনো ভয় আর কোথাও রইল না।

আর ওটা কি ভয়ানক মিথ্যা—ঐ যে "আমি আছি।" কৈ আছ, তুমি আছ কোথায়? তুমি ভবসমুদ্রের কোন্ ফেনা-গুলাকে আশ্রয় করে বলচ "আমি আছি।" যে বুদ্বুদটি যখনি ফেটে যাচ্চে তাতে তখনি তোমারই ক্ষয় হয়ে যাচ্চে, সংসারে দীর্ঘনিশ্বাসের যে লেশমাত্র তপ্ত হাওয়াটুকু তোমার গায়ে এসে লাগচে তাতে একেবারে তোমার সত্তাকেই গিয়ে ঘা দিচ্চে। তুমি আছ কিসের উপরে? তুমি কে? অথচ আমার অন্তরের মানুষ যখন বল্‌চে "চাই" তখন তুমি অহঙ্কার করে তাকে গিয়ে বলচ, আমি আছি, তুমি আমাকেই চাও, তুমি আমাকে নিয়েই খুসি থাক। এ তোমার কেমন দান! তোমার প্রকাণ্ড

বোঝা বইবে কে? এ যে বিষম ভার! এ যে কেবলি বস্তুর পরে বস্তু, কেবলি ক্ষুধার পরে ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষের পরে দুর্ভিক্ষ! এ ত তোমাকে আশ্রয় করা নয়, এ যে তোমাকে বহন করা। তুমি যে পঙ্গু, তোমার যে পা নেই, তুমি যে কেবলি অন্যের উপরেই ভর দিয়ে সংসারে চলে বেড়াও! তোমার এ বোঝা যেখানকার সেইখানেই পড়ে পড়ে ধূলোর সঙ্গে ধূলো হয়ে যেতে থাক! যে মানুষটি যাত্রী, যে পথের পথিক, অনন্তের অভিমুখে যার ডাক আছে, সে তোমার এই ভার টেনে টেনে বেড়াবে কেন? এই সমস্ত বোঝার উপর দিনরাত্রি বুক দিয়ে চেপে পড়ে থাকবে, সে সময় তার কোথায়? এই জন্যে সে তাঁকেই চায় যাঁর উপরে সে ভর দিতে পারবে, যাঁর ভার তাকে বইতে হবে না। তুমি কি সেই নির্ভর নাকি? তবে কি ভরসা দেবার জন্যে তুমি তার কানের কাছে এসে মন্ত্র জপচ—"আমি আছি!"

পিতা নোঽসি—পিতা তুমি আছ; তুমি আছ—এই আমার অন্তরের একমাত্র মন্ত্র। তুমি আছ এই দিয়েই আমার জীবনের এবং জগতের সমস্ত কিছু পূর্ণ। "সত্যং" এই বলে ঋষিরা তোমাকে একমনে জপ করেছেন—সে কথাটির মানে হচ্চে এই যে, পিতানোঽসি, পিতা তুমি আছ। যা সত্য তা শুধুমাত্র সত্য নয়, তাই আমার পিতা।

কিন্তু তুমি আছ এই বোধটিকেত সমস্ত প্রাণমন দিয়ে পেতে হবে! তুমি আছ—এ ত শুধু একটা মন্ত্র নয়—তুমি আছ, এটা ত শুধু কেবল একটা জেনে রাখবার কথা নয়। "তুমি আছ" এই বোধটিকে যদি আমি পূর্ণ করে না যেতে পারি তবে কিসের জন্যে এ জগতে এসেছিলুম—কেনই বা কিছু দিনের জন্য নানা জিনিস আঁকড়ে ধরে ধরে ভেসে বেড়ালুম—শেষ কালে কেনই বা এই অসংলগ্ন নিরর্থকতার মধ্যে হঠাৎ দিন ফুরিয়ে গেল?

শক্ত হয়েছে এই যে, আমি আছি এই বোধটিকেই আমি দিবারাত্রি সকল রকম করেই অভ্যাস করে ফেলেছি। জীবনের সকল চেষ্টাতেই কেবল এই আমিকেই নানা রকম করে স্বীকার করে এসেছি, প্রতিদিনের সমস্ত খাজনা তারই হাতে শেষ কড়াটি পর্য্যন্ত জমা করে দিয়েছি। আমি-বোধটা একেবারে অস্থিমজ্জায় জড়িয়ে গেছে, সে যদি বড় দুঃখ দেয় তবু তাকে অন্যমনস্ক হয়েও চেপে ধরি, তাকে ভুলতে ইচ্ছা করলেও ভুলতে পারিনে!

সেই জন্যেই আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনা এই যে, পিতা নো বোধি—তুমি যে পিতা, তুমি যে আছ এই সত্যের বোধে আমার সমস্ত জীবনকে পূর্ণ করে দাও। পিতা নো বোধি—পিতার বোধ দিয়ে আমার সমস্তকে সমস্তটা ভরে তোলো, কিছুই আর বাকি না থাক; আমার প্রত্যেক নিশ্বাস প্রশ্বাস পিতার বোধ নিয়ে আমার সর্ব্বশরীরে

প্রাণের আনন্দ তরঙ্গিত করে তুলুক, আমার সর্ব্বাঙ্গের স্পর্শ-চেতনা পিতার বোধে পুলকিত হয়ে উঠুক, পিতার বোধের আলোক আমার দুই চক্ষুকে অভিষিক্ত করে দিক! পিতা নো বোধি—আমার জীবনের সমস্ত সুখকে পিতার বোধে বিনম্র করে দিক—আমার জীবনের সমস্ত দুঃখকে পিতার বোধ করুণাবর্ষণে সফল করে তুলুক! আমার ব্যথা, আমার লজ্জা, আমার দৈন্য, সকলের সঙ্গে আমার সমস্ত বিরোধ, পিতার বোধের অসীমতার মধ্যে একেবারে ভাসিয়ে দিই। এই বোধ প্রতিদিন প্রসারিত হতে থাক—নিকট হতে দূরে দূর হতে দূরান্তরে—আত্মীয় হতে পরে, মিত্র হতে শত্রুতে, সম্পদ হতে বিপদে, জীবন হতে মৃত্যুতে—প্রসারিত হতে থাক—প্রিয় হতে অপ্রিয়ে, লাভ হতে ত্যাগে, আমার ইচ্ছা হতে তোমার ইচ্ছায়।

প্রতিদিন মন্ত্র পড়ে গিয়েছি, পিতা নো

বোধি, কিন্তু একবারও মনেও আনিনি কত বড় চাওয়া চাচ্চি—মনেও আনিনি এই প্রার্থনাকে যদি সত্য করে তুলতে চাই তবে জীবনের সাধনাকে কত বড় সাধনা করতে হবে। কত ত্যাগ, কত ক্ষমা, কত পাপের ক্ষালন, কত সংস্কারের আবরণ-মোচন, কত হৃদয়ের গ্রন্থি-ছেদন—জীবনকে সত্য করতে না পারলে সেই অনন্ত সত্যের বোধকে পাব কেমন করে, নিজের নিষ্ঠুর স্বার্থকে ত্যাগ করতে না পারলে সেই অনন্ত করুণার বোধকে গ্রহণ করব কেমন করে? সত্যে মঙ্গলে দয়ায় সৌন্দর্য্যে আনন্দে নির্ম্মলতায় ভরে রয়েছে, সমস্ত ঘন হয়ে ভরে রয়েছে—সেই ত আমার পিতা, সর্ব্বত্র আমার পিতা। পিতা নোঽসি, পিতা নোঽসি—এই মন্ত্রের অক্ষরই সমস্ত আকাশে, এই মন্ত্রের ধ্বনিই জ্যোতির্ম্ময় স্বরসপ্তকের বিশ্বসঙ্গীত; পিতা তুমি আছ এই মন্ত্রই কত অসংখ্য-রূপ ধরে লোকলোকান্তরে সমস্ত জীবকে

কোলে করে নিয়ে সুখদুঃখের অবিরাম বৈচিত্র্যে সৃষ্টিকে প্রাণপরিপূর্ণ করে রয়েছে। অসীম চেতন-জগতের মধ্যে নিয়ত উদ্বেলিত তোমার যে পিতার আনন্দ—যে আনন্দে তুমি আপনাকেই আপন সন্তানের মধ্যে নিরীক্ষণ করে লীলা করচ ;—যে আনন্দে তুমি তোমার সন্তানের মধ্যে ছোট হয়ে নত হয়ে আসচ এবং তোমার সন্তানকে তোমার মধ্যে বড় করে তুলে নিচ্চ—সেই তোমার অপরিসীম পিতার আনন্দকেই সকলের চেয়ে সত্য করে আপনার সকলের চেয়ে পরম সম্পদ করে বোধ করতে চাচ্চে আমার অন্তরাত্মা—তবু সেই জায়গায় আমি কেবলি তার কাছে এনে দিচ্চি আমার অহংকে। সেই অহংকে কিছুতেই আমি তাড়াতে পারচি নে, তার কাছে আমার নিজের জোর আর কিছুতেই খাটে না, অনেক দিন হল তার হাতেই আমার সমস্ত কেল্লা আমি ছেড়ে দিয়ে বসে আছি ; আমার সমস্ত অস্ত্র

সেই নিয়েছে, আমার সমস্ত ধনের সেই অধিকারী। সেই জন্যেই তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা—পিতা নো বোধি—পিতা, এই বোধ তুমিই আমার মনে জাগাও! এই বোধটিকে একেবারে বাধাহীন করে লাভ করি যে, আমার অস্তিত্ব এ কেবলমাত্রই সন্তানের অস্তিত্ব;—আমি ত আর কারো নই, আর কিছুই নই, তোমার সন্তান এই আমার একটি-মাত্র সত্য; এই সন্তানের অস্তিত্বকে ঘিরে ঘিরে অন্তরে বাহিরে যা কিছু আছে, এ সমস্তই পিতার আনন্দ ছাড়া আর কিছুই নয়:—এই জল-স্থল-আকাশ, এই জন্মমৃত্যুর জীবনকাব্য, এই সুখদুঃখের সংসারলীলা, এ সমস্তই সন্তানের জীবনকে আলিঙ্গন করে ধরচে। এইবার কেবল আমার দিকের দরকার আমার সমস্ত প্রাণটা পিতা বলে সাড়া দিয়ে উঠুক। উপরের ডাকের সঙ্গে নীচের ডাকটি মিলে যাক—আমার দিক থেকে কেবল এইটেই বাকি আছে।

তোমার দিক থেকে একেবারে জগৎ ভরে উঠল—তুমি আপনাকে দিয়ে আর শেষ করতে পারলে না—পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ একেবারে ছাপিয়ে পড়ে যাচ্চে—কিন্তু তোমার এই এত বড় আকাশভরা আত্মদান আমরা দেখতেই পাচ্চিনে, গ্রহণ করতেই পারচিনে—কিসের জন্যে? ঐ এতটুকু একটুখানি আমির জন্যে। সে যে সমস্ত অনন্তের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বলচে, আমি! একবার একটুখানি থাম! একবার আমার জীবনের সব চেয়ে সত্য বলাটা বলতে দে, একবার সন্তান-জন্মের চরম ডাকটা ডাকতে দে—পিতা নোঽসি! পিতা পিতা, পিতা,—তুমি, তুমি, তুমি, কেবল এই কথাটা,—অন্ধকারে আলোতে নির্ভয়ে গলা খুলে কেবল—আছ, আছ, আছ। 'আমি' তার সমস্ত বোঝাসুদ্ধ একেবারে তলিয়ে যাক সেই অতলস্পর্শ সত্যে যেখানে তুমি তোমার সন্তানকে আপনার পরিপূর্ণ আনন্দে আবৃত

করে জানচ; তেমনি করে সন্তানকেও জানতে দাও তার পিতাকে। তোমার জানা এবং তার জানার মাঝখানকার বাধাটা একেবারে ঘুচে যাক—তুমি যেমন করে আপনাকে দান করেচ তেমনি করে আমাকে গ্রহণ কর।

নমস্তেঽস্তু—তোমাকে যেন নমস্কার করতে পারি! এই আমার পিতার বোধ যখন জাগে তখন নমস্কারের মধুর রসে সমস্ত জীবন একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। সর্ব্বত্র যখন পিতাকে পাই তখন সর্ব্বত্র হৃদয় আনন্দে অবনত হয়ে পড়ে। তখন শুনতে পাই জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের গভীরতম মর্ম্মকুহর হতে একটিমাত্র ধ্বনি অনন্তের মধ্যে নিশ্বসিত হয়ে উঠচে—নমোনমঃ। লোকে লোকান্তরে, নমোনমঃ। সুমধুর সুগম্ভীর নমোনমঃ। তখন দেখতে পাই নমস্কারে নমস্কারে নক্ষত্রের সঙ্গে নক্ষত্র একটিমাত্র জায়গায় তাদের জ্যোতির্ম্ময় ললাটকে মিলিত করেছে। সমস্ত বিশ্বের এই আশ্চর্য্য

সুন্দর সামঞ্জস্য—যে সামঞ্জস্য কোথাও কিছু-মাত্র ঔদ্ধত্যের দ্বারা সৃষ্টির বিচিত্র ছন্দকে একটুও আঘাত করচে না, আপনার অণুতে পরমাণুতে অনন্তের আনন্দকে সম্পূর্ণ মেনে নিচ্চে—এই ত সেই নমস্কারের সঙ্গীত—ঊর্দ্ধে অধোতে দিকে দিগন্তরে নমোনমঃ। এই সমস্ত বিশ্বের নমস্কারের সঙ্গে আমার চিত্ত যখন তার নমস্কারটিকেও এক করে দেয়, সে যখন আর পৃথক্ থাকতে পারে না—তখন সে চিরকালের মত ধন্য হয়—তখনই সে বুঝতে পারে, আমি বেঁচে গেলুম আমি রক্ষা পেলুম—তখনই জগতের সমস্তের মধ্যেই সে আপনার পিতাকে পেলে—কোনো জায়গায় তার আর কোনো ভয় রইল না।

পিতা, নমস্তেঽস্তু—তোমাকে যেন নমস্কার করতে পারি। এই পারাই চরম পারা—এই পারাতেই জীবনের সকল পারা শেষ হয়ে যায়। যেন নমস্কার করতে পারি! সমস্ত যাত্রার

অবসানে নদী যেমন আপনাকে দিয়ে সমুদ্রকে এসে নমস্কার করে, সেই নমস্কারটিতেই তার সমস্ত পথযাত্রা একেবারে নিঃশেষে সার্থক—হে পিতা তেমনি করে একটি পরিপূর্ণ নমস্কারে তোমার মধ্যে আপনাকে যেন শেষ করে দিতে পারি। এই যে আমার বাহিরের মানুষটা, এই আমার সংসারের মানুষটা, জন্ম ও মৃত্যুর মাঝখানকার অতি ক্ষুদ্র এই মানুষটা—এ কেবল মাথাটাকে সকলের চেয়ে উঁচুতে তুলে বুক ফুলিয়ে বেড়াতে চায়। সকলের চেয়ে আমি তফাৎ থাকব, সকলের চেয়ে আমি বড় হব—এতেই তার সকলের চেয়ে সুখ। তার একমাত্র কারণ এই, আপনার মধ্যে তার আপনার স্থিতি নেই। বাইরের বিষয়ের উপরেই তার স্থিতি—যত জিনিস বাড়ে ততই সে বাড়ে, নিজের মধ্যে সে শূন্য, সেখানে তার কোনো সম্পদ নেই এইজন্য বাইরে ধন যত জমে ততই সে ধনী হয়। জিনিসপত্র নিয়েই

যাকে বড় হতে হয় সে ত সকলের সঙ্গে মিলতে পারে না ;—জিনিসপত্র ত জ্ঞান নয়, প্রেম নয়—সকলকে দান করার দ্বারাই ত সে আরো বাড়ে না, ভাগ করার দ্বারাই ত সে আরো ঘনীভূত হয়ে উঠে না—তার থেকে যা যায়, তা যায়, সে ত আরো দ্বিগুণ হয়ে ফিরে আসে না—তার যা আমার তা আমার, যা অন্যের তা অন্যেরই—এই জন্যে যে মানুষটা উপকরণ নিয়েই বড় হয়, সকলের থেকে তফাৎ হয়েই সে বড় হয় ;—আপনার সম্পদকে সকলের সঙ্গে মেলাতে গেলেই তার ক্ষতি হতে থাকে ; এইজন্যে যতই সে বড় হয় ততই তার আমিটাই উঁচু হয়ে উঠতে থাকে, ততই চারিদিকের সঙ্গে তার যোগ বিচ্ছিন্ন হতে থাকে—এবং তার সমস্ত সুখই অহঙ্কারের রূপ ধারণ করে অন্য সকলকে অবনত করতে চায়। এমনি করে বিশ্বের সঙ্গে বিরোধের দ্বারাই সে যে দুঃসহ তাপের

সৃষ্টি করে সেইটেকেই সে আপনার প্রতাপ বলে গণ্য করে।

কিন্তু আমার অন্তরের নিত্য মানুষটি ত দিনরাত্রি মাথা উঁচু করে বেড়াতে চায় নি—সে নমস্কার করতেই চেয়েছিল। তার সমস্ত আনন্দ, নমস্কারের দ্বারা বিশ্বজগতে প্রবাহিত হয়ে যেতে চেয়েচে, নমস্কারের দ্বারা তার আত্ম-সমর্পণ পরিপূর্ণ হতে চায়। নমস্কারের দ্বারা সে আপনাকে সেই জায়গাতেই প্রসারিত করে যেখানে তুমি তোমার পা রেখেছ, যেখানে তোমার চরণাশ্রয় করে জগতের ছোট বড় সকলেই এক জায়গায় এসে মিলেছে—যেখানে দরিদ্রকে ধনী দ্বারের বাইরে দাঁড় করাতে পারে না, শূদ্রকে ব্রাহ্মণ দূরে সরিয়ে রেখে দিতে পারে না—সেই ত সকলের চেয়ে নীচের জায়গা, সেই ত সকলের চেয়ে প্রশস্ত জায়গা; সেই তোমার অনন্ত-প্রসারিত পাদপীঠ—আমার অন্তরাত্মা পরিপূর্ণ নমস্কারের দ্বারা সেই সর্ব্ব-

জন-ভোগ্য মহাপুণ্যস্থানের অধিকারটি পেতে ব্যাকুল হয়ে আছে। যে স্থানটি নিয়ে রাজা তার কাছ থেকে খাজনা দাবি করবে না, পাশের মানুষ তার সঙ্গে লাঠালাঠি করতে আসবে না, সত্য নমস্কারটিই যে স্থানের এক-মাত্র সত্য দলিল সেই সম্পত্তিই আমার অন্তরাত্মার পৈতৃক সম্পত্তি।

জল যখন তাপের দ্বারা হাল্কা হয়ে যায় তখনি সে বাষ্প হয়ে উপরে চড়তে থাকে। তখনি সে পৃথিবীর সমস্ত জলরাশির সঙ্গে আপনার সম্বন্ধকে পৃথক্ করে ফেলে—তখনি সে ব্যর্থ হয়ে স্ফীত হয়ে উড়ে বেড়ায়, তখনি সে আলোককে আবৃত করে। কিন্তু তৎ-সত্ত্বেও, সকলেই জানে, জলের যথার্থ স্বধর্ম্মই হচ্চে সে আপনার সমতলতাকেই চায়। সেই সমতলতাকে চাওয়ার মধ্যেই তার নমস্কারের প্রার্থনা—সেই নমস্কারের দ্বারাই সে রসধারায় সকল দিকে প্রবাহিত হয়, পৃথিবীর মাটিকে

সফলতায় অভিষিক্ত করে দেয়—তার সেই প্রণত সাষ্টাঙ্গ নমস্কারই সমস্ত পৃথিবীর কল্যাণ। যে লঘুবাষ্পরাশি পৃথক্ হয়ে উঁচুতে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় নীচেকার সঙ্গে আপনার কোনো আত্মীয়তা স্বীকার করতেই চায় না, তার গায়ে শুভক্ষণে যেই একটু রসের হাওয়া লাগে, যেই সে আপনার যথার্থ গৌরবে ভরে ওঠে, অম্‌নি সে আপনাকে আর ধারণ করে রাখতে পারে না—নমস্কারে বিগলিত হয়ে সেই সর্ব্ব-জনের নিম্নক্ষেত্রে, সেই সকলের মাঝখানে এসে লুটিয়ে পড়তে থাকে। তখনি জলের সঙ্গে জল মিশে যায়, তখনি মিলনের স্রোত চারদিকে ছুটে বইতে থাকে, বর্ষণের সঙ্গীতে দশদিক মুখরিত হয়ে ওঠে, প্রত্যেক জলবিন্দু তখনি আপনাকে সত্যরূপে লাভ করে, আপনার ধর্ম্মে আপনি পূর্ণ হয়ে ওঠে।

তেমনি আমার অন্তরের মানুষটি অন্তরে অন্তরে আপনাকে বর্ষণ করতে, আপনাকে

সমর্পণ করতে চাচ্চে। এই তার যথার্থ ধর্ম্ম। সে অহঙ্কারের বাধা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দিয়ে নমস্কারের গৌরবকেই চাচ্চে,—পরিপূর্ণ প্রণতির দ্বারা নিখিলের সমস্তের সঙ্গে আপনার সুবৃহৎ সমতলতা লাভের জন্য চিরদিন সে উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। আপনার সেই অন্তরতম স্বধর্ম্মটিকে যে পর্য্যন্ত সে না পাচ্চে সেই পর্য্যন্তই তার যত কিছু দুঃখ, যত কিছু অপমান। এইজন্যেই সে প্রতিদিন জোড় হাত করে বলচে, নমস্তেঽস্তু —তোমাকে যেন নমস্কার করতে পারি।

তোমাকে নমস্কার করা, এ কথাটি সহজ কথা নয়; এ ত কেবল অভ্যস্ত ভাবে মাথা নীচু করা নয়! পিতানোঽসি—তুমি আমাদের সকলেরই পিতা, এই কথাটিকে ত সহজে বলতে পারলুম না। যখন ভেবে দেখি এই কথাটি বলবার পথ প্রতিদিনই সকল ব্যবহারেই কেমন করে অবরুদ্ধ করে ফেলচি তখন মনে ভয় হয়—মনে করি, সন্তানের নমস্কার বুঝি

এ জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত আর সম্পূর্ণ হতে পারল না, মানুষের জীবনে যে রস সকল রসের সার সেই পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের মধুরতম রসটি হৃদয়ের মধ্যে বুঝি কণামাত্রও জায়গা পেল না! কেমন করেই বা পাবে? শুষ্ক যে সে আপনার শুষ্কতা নিয়েই গর্ব্ব করে, ক্ষুদ্র যে সে যে আপনার ক্ষুদ্রতা নিয়েই উদ্ধত হয়ে ওঠে! স্বাতন্ত্র্যের সঙ্কীর্ণতাকে ত্যাগ করতে গেলে সে যে কেবলি মনে করে আমি আমার আত্মাকেই খর্ব্ব করলুম। সে যে নমস্কার করতে চাচ্চেই না। তার এমনি দুর্দ্দশা যে উপাসনার সময় যখন সে তোমার কাছে আসে তখনো সে আপনার অহংটাকেই এগিয়ে নিয়ে আসে। সংসারক্ষেত্রে যেখানে সমস্তই আত্মপর ও উচ্চনীচের দ্বারা আমরা সীমাচিহ্নিত করে রেখেছি, সেখানে সর্ব্বলোক-পিতা যে তুমি, তোমাকে নমস্কার করবার ত জায়গাই পাইনে—তোমাকে সত্যকার নমস্কার

করতে গেলে সকল দিকেই নানা দেয়ালেই মাথা ঠেকে যায়—কিন্তু তোমার এই পূজার ক্ষেত্রে যেখানে কেবল ক্ষণকালের জন্যেই আমরা পরিচিত অপরিচিত, পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, তোমারই নামে একত্র সমবেত হই, সেখানেও যে মুহূর্ত্তেই আমরা মুখে উচ্চারণ করচি, পিতানোঽসি, তুমি আমাদের সকলের পিতা, তুমিই আছ, তুমিই সত্য—সেই মুহূর্ত্তেই আমরা মনে মনে লোকের জাতি বিচার করচি, বিদ্যা বিচার করচি, সম্প্রদায় বিচার করচি—যখনি বলচি নমস্তেঽস্তু তখনি নমস্কারকে অন্তরে কলুষিত করচি, সকলের পিতা বলে যে অসঙ্কুচিত নমস্কার তোমাকেই দিতে এসেছি তার অধিকাংশই তোমার কাছ থেকে হরণ করে নিয়ে আমার সমাজটারই পায়ের কাছে স্থাপন করচি! সংসারে আমার অহং নিজের জোরে স্পষ্ট করেই প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে বেড়ায়; সেখানে তার নিজের পূর্ণ অধিকার

সম্বন্ধে নিজের কোনো সংশয় বা লজ্জা নেই; এখানে তোমার পূজার ক্ষেত্রে তার অনধিকারের বাধাকে এড়াবার জন্যে সে নিজেকে প্রচ্ছন্ন করে আসে—কিন্তু এখানে তার সকলের চেয়ে ভয়ঙ্কর স্পর্দ্ধা এই যে, ছদ্মবেশে তোমারি সে অংশী হতে চায়, তোমার নামের সঙ্গে সে নিজের নামকে জড়িত করে এবং তোমার পূজার মধ্যেও সে নিজের অপবিত্র হস্তকে প্রসারিত করতে কুণ্ঠিত হয় না!

এমনি করে কি চিরদিনই আমরা তোমার নমস্কারকেও সাম্প্রদায়িক সামাজিক প্রথার মধ্যে এবং ব্যক্তিগত অভ্যাসের মধ্যেই ঠেলে রেখে দেব? কিন্তু কেন? তার প্রয়োজন কি আছে! তোমাকে নমস্কার ত আমার টাকা নয় কড়ি নয়, ঘর নয় বাড়ি নয়। তোমাকে নমস্কার করে আমার বাইরের মানুষটি ত তার থলির মধ্যে কিছুই ভরতে পারে না। রাজাকে

নমস্কার করলে তার লাভ আছে, সমাজকে নমস্কার করলে তার সুবিধা আছে, প্রবলকে নমস্কার করলে তার সাংসারিক অনেক আপদ এড়ায়—কিন্তু সে যদি দলের দিকে সমাজের দিকে অনিমেষ নেত্র মেলেই থাকে তবে তোমাকে নমস্কার করার কথা উচ্চারণ করবারই বা তার লেশমাত্র প্রয়োজন কি আছে?

প্রয়োজন যে একমাত্র তারই যে আমার ভিতরের মানুষ—সে যে নিত্য মানুষ—সে ত সংসারের মানুষ নয়, সে ত সমাজের কাছ থেকে ছোট বড় কোনো উপাধি গ্রহণ করে সেই চিহ্নে আপনাকে চিহ্নিত করে না। তার চরম প্রয়োজন সকলের সঙ্গে আপনাকে এক করে জানা—তাহলেই সে আপনাকে সত্য জানতে পারে—সেই সত্য জানা থেকে বঞ্চিত হলেই সে মুহ্যমান হয়ে অপবিত্র হয়ে জগতে বাস করে;—আপনাকে সত্যরূপে জানবার জন্যেই, সমাজ সংস্কারের সঙ্কীর্ণ জালের মধ্যে

নিজেকে নিত্যকাল জড়িত করে রাখবার দীনতা হতে উদ্ধার পাবার জন্যেই, সে ডাক্‌চে, তার পিতাকে, সে ডাকচে নিখিল মানুষের পিতাকে—সেই তার পিতার বোধের মধ্যেই তার আপনার বোধ সত্য হবে, তার বিশ্বের সম্বন্ধ সম্পূর্ণ হবে। এ ডাক সমাজের ডাক নয়, সম্প্রদায়ের ডাক নয়, এ ডাক অন্তরাত্মার ডাক; এ ডাক কুলশীলের ডাক নয়, মানসম্ভ্রমের ডাক নয়, এ ডাক সন্তানের ডাক;—এই একটি মাত্র ডাকেই সকল সন্তানের কণ্ঠ এক সুরে মেলে,—এই পিতানোঽসি। তাই এ ডাকের সঙ্গে কোনো অহঙ্কার কোনো সংস্কারকে মেলাতে গেলেই এই পরম সঙ্গীতকে একমুহূর্ত্তেই বেসুরো করা হবে—তাতে আত্মা পীড়িত হবে এবং হে পরমাত্মন্ তাতে তোমাকেই বেদনা দেওয়া হবে যে তুমি সকল সন্তানের ব্যথার ব্যথী।

তাই তোমার কাছে অন্তরের এই অন্তরতম

প্রার্থনা—যেন নত হই, নত হই ! সেই নতি দীনতার নতি নয়, সে যে পরম পরিপূর্ণতার প্রণতি। তোমার কাছে সেই একান্ত নমস্কার আত্মসমর্পণের পরমৈশ্বর্য্য। আমাদের সেই নমস্কার সত্য হোক, সত্য হোক—অহং শান্ত হোক, অহঙ্কার ক্ষয় হোক, ভেদবুদ্ধি দূর হোক, পিতার বোধ পূর্ণ হোক এবং বিশ্বভুবনে সন্তানের প্রণামের সঙ্গে পিতার বিগলিত আনন্দধারা সম্মিলিত হোক ! নমস্তেঽস্তু !

সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক তোমার এ সংসারে
    একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে।
ঘনশ্রাবণ মেঘের মত রসের ভারে নম্র নত
সমস্ত মন থাক পড়ে থাক তব ভবনদ্বারে,
    একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে।
নানা সুরের আকুল ধারা মিলিয়ে দিয়ে আত্মহারা
সমস্ত গান সমাপ্ত হোক নীরব পারাবারে,
    একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে।

হংস যেমন মানসযাত্রী,—তেমনি সারাদিবসরাত্রি
সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক মরণপরপারে—
একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে।

১১ই মাঘ, ১৩১৮।

সৃষ্টির অধিকার

দিনতো যাবেই—এমনি করেই তো দিনের পর দিন গিয়েছে। কিন্তু সব মানুষেরই ভিতরে এই একটি বেদনা রয়েছে যে, যেটা হবার সেটা হয়নি! দিনতো যাবে, কিন্তু মানুষ কেবলি বলেচে—হবে, আমার যা হবার তা আমাকে হতেই হবে, এখনো তার কিছুই হয় নি। তাই যদি না হয়ে থাকে তবে মানুষ আর কিসে মানুষ, পশুর সঙ্গে তার পার্থক্য কোথায়? পশু তার প্রাত্যহিক জীবনে তার যে সমস্ত প্রবৃত্তি রয়েছে তাদের চরিতার্থতা সাধন করে যাচ্ছে, তার মধ্যে তো কোন বেদনা নেই। এখনো যা হয়ে ওঠবার তা হয়নি, একথাতো তার কথা নয়। কিন্তু

মানুষের জীবনের সমস্ত কর্ম্মের ভিতরে ভিতরে এই বেদনাটি রয়েছে—হয়নি, যা হবার তা হয়নি। কি হয়নি? আমি যা হব বলে পৃথিবীতে এলুম তাই যে হলুম না, সেই হবার সংকল্প যে জোর করে নিতে পারলুম না। আমার পথ আমি নেব, আমার যা হবার আমি তাই হব —এই কথাটি জোর করে বলতে পারলুম না বলেই এই বেদনা জেগে উঠচে যে হয়নি, হয়নি—দিন আমার বৃথাই বয়ে যাচ্ছে। গাছকে পশুপক্ষীকে তো এ সংকল্প করতে হয় না—মানুষকেই এই কথা বলতে হয়েচে যে আমি হব। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এ সংকল্পকে সে দৃঢ়ভাবে ধরতে পারছে না, এই কথা সে জোর করে বলতে পারছে না, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ পশুপক্ষী তরুলতার সঙ্গে সমান। কিন্তু ভগবান তাকে তাদের সঙ্গে সমান হতে দেবেন না, তিনি চান যে তাঁর বিশ্বের মধ্যে কেবল মানুষই আপনাকে গড়ে তুলবে, আপনার

ভিতরকার মনুষ্যত্বটিকে অবাধে প্রকাশ করবে। সেইজন্যে তিনি মানুষের শিশুকে সকলের চেয়ে অসহায় করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন— তাকে উলঙ্গ করে দুর্ব্বল করে পাঠিয়েছেন। আর সকলেরি জীবনরক্ষার জন্যে যে সকল উপকরণের দরকার তা তিনি দিয়েছেন; বাঘকে তীক্ষ্ণ নখদন্ত দিয়ে সাজিয়ে পাঠিয়েছেন। কিন্তু এ কি তাঁর আশ্চর্য্য লীলা যে মানুষের শিশুকে তিনি সকলের চেয়ে দুর্ব্বল, অক্ষম ও অসহায় করে দিয়েছেন—কারণ এরি ভিতর থেকে তিনি তাঁর পরমা শক্তিকে দেখাবেন। যেখানে তাঁর শক্তি সকলের চেয়ে বেশি থেকেও সকলের চেয়ে প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েচে সেই-খানেই তো তাঁর আনন্দের লীলা। এই দুর্ব্বল মনুষ্যশরীরের ভিতর দিয়ে যে একটি পরমা শক্তি প্রকাশিত হবে এই তাঁর আহ্বান।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর সব তৈরি, চন্দ্র সূর্য্য তরুলতা সমস্তই তৈরি, কেবল মানুষকেই

তিনি অসম্পূর্ণ করে পাঠিয়েছেন। সকলের চেয়ে অসহায় করে মায়ের কোলে যাকে পাঠালেন, সেই যে সকলের চেয়ে শক্তিশালী ও সম্পূর্ণ হবার অধিকারী, এই লীলাই তো তিনি দেখাবেন। কিন্তু আমরা কি তাঁর এই ইচ্ছাকে ব্যর্থ করব? তিনি বাইরে আমাদের যে দুর্ব্বলতার বেশ পরিয়ে পাঠিয়েছেন তারি মধ্যে আমরা আবৃত থাকব—এ হলে আর কি হল? এ পৃথিবীতে তো কোথাও দুর্ব্বলতা নেই—এই পৃথিবীর ভূমি কি নিশ্চল অটল, সূর্য্য চন্দ্র গ্রহনক্ষত্র আপন আপন কক্ষপথে কি স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত—এখানে একটি অনুপরমাণুরও নড়চড় হবার জো নেই—সমস্তই তাঁর অটল শাসনে তাঁর স্থির নিয়মে বিধৃত হয়ে নিজ নিজ কাজ করে যাচ্ছে। কেবল মানুষকেই তিনি অসম্পূর্ণ করে রেখেছেন। তিনি ময়ূরকে নানা বিচিত্র রঙে রঙিয়ে দিয়েছেন, মানুষকে দেননি—তার ভিতরে

রঙের একটি বাটী দিয়ে বলেছেন, তোমাকে তোমার নিজের রঙে সাজ্‌তে হবে। তিনি বলেছেন তোমার মধ্যে সবই দিলুম, কিন্তু তোমাকে সেই সব উপকরণ দিয়ে নিজেকে কঠিন করে সুন্দর করে আশ্চর্য্য করে তৈরি করে তুলতে হবে, আমি তোমাকে তৈরি করে দেব না। আমরা তা না করে যদি যেমন জন্মাই তেমনিই মরি, তবে তাঁর এই লীলা কি ব্যর্থ হবে না?

কি নিয়ে আমাদের দিনের পর দিন যাচ্চে? প্রতিদিনের আবর্ত্তনে কি জন্যে যে ঘুরে মরছি তার কোনো ঠিকানাই নেই। আজ যা হচ্চে, কালও তাই হচ্চে—একদিনের পর কেবল আর এক দিনের পুনরাবৃত্তি চলচে—ঘানিতে জোতা হয়ে আছি, ঘুরে বেড়াচ্ছি—একই জায়গায়। এর মধ্যে এমন কোনো নতুন আঘাত পাচ্চি না যাতে মনে পড়ে আমি মানুষ। এই সাংসারিক জীবনযাত্রার

প্রাত্যহিক অভ্যস্ত কর্ম্মে আমরা কি পাচ্চি, আমরা কি জড় করছি? এই সব জীর্ণ বোঝার মধ্যে একদিন কি এম্‌নি ভাবেই জীবন পরিসমাপ্ত হবে? অভ্যাস, অভ্যাস—তারি জড় স্তূপের নীচে তলিয়ে যাচ্ছি—তারি উপরে যে আমাদের একদিন ঠেলে উঠ্‌তে হবে সেই কথাটিই ভুলে যাচ্চি। মলিনতার উপর কেবলি মলিনতা জমা হচ্চে—অভ্যাসকে কেবলি বেড়ে যেতে দেওয়া হচ্চে—এমনি করে নিজের কৃত্রিমতার বেড়ার মধ্যে সঙ্কীর্ণ জায়গায় আমরা আবদ্ধ হয়ে রয়েছি—বিশ্বভুবনের আশ্চর্য্য লীলাকে দেখ্‌তে পাচ্চি না। দেখ্‌বার বেলা দেখি—উপকরণ, আসবাব, বাঁধা নিয়মে জীবন-যন্ত্রের চাকা চালানো। তাঁর আলো আর ভিতরে আস্‌তে পথ পায় না—ঐ সব জিনিসগুলো আড়াল হয়ে দাঁড়ায়। তিনি আমাদের কাছে আস্‌বেন বলে বলে দিয়েচেন—তুমি তোমার আসন-

খানি তৈরি করে দাও, আমি সেই আসনে বস্‌ব, তোমার ঘরে গিয়ে বস্‌ব। অথচ আমরা যা কিছু আয়োজন করছি সে সব নিজের জন্যে, তাঁকে বাদ দিয়ে বসেচি। জগৎ জুড়ে শ্যামল পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য্যের মধ্যে তিনি আপনাকে বিকীর্ণ করে রয়েছেন, কেবল একটুখানি কালো জায়গা, আমাদের হৃদয়ের সেই কালো কলঙ্কে মলিন ধূলিতে আচ্ছন্ন সেই একটুমাত্র কালো জায়গাতে তাঁর স্থান হয় নি, সেইখানে তাঁকে আস্‌তে নিষেধ করে দিয়েচি। সেই জায়গাটুকু আমার, সেখানে আমর টাকা রাখ্‌ব, আস্‌বাব জমাব, ছেলের জন্য বাড়ীর ভিৎ কাট্‌ব—সেখানে তাঁকে বলি,—তোমাকে ওখানে যেতে দিতে পার্‌ব না, তোমাকে ওখান থেকে নির্ব্বাসিত করে দিলুম। তাই এই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখ্‌চি যে, যে-মানুষ সকলের চেয়ে বড়, যার মধ্যে ভূমার প্রকাশ, সেই মানুষেরই কি

সকলের চেয়ে অকৃতার্থ হবার শক্তি হোল? আমাদের যে সেই শক্তি তিনিই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—আর সব জায়গায় আমি রয়েছি, কিন্তু তোমার ঘরে নিমন্ত্রণ না করলে আমি যাব না। তিনি বলেচেন—তোমরা কি আমাকে ডাকবে না? তোমরা যা ভোগ কর্‌চ আমাকে তার একটু অংশ দেবে না? যারা কেড়ে নেবার লোক তারা কেড়ে নেয় —তারা অনাদর সইতে পারে না; আর যিনি দ্বারের বাইরে প্রতীক্ষা করে দাঁড়িয়ে রয়েচেন—তাঁকেই বলেচি, তোমাকে দিতে পারব না। দিনের পর দিন কি এই কথা বলে আমরা সব ব্যর্থ করি নি? একদিন আমাদের এ সংকল্প নিতেই হবে— বল্‌তে হবে, আমার ধন জন মান, আমার সমস্ত খ্যাতি প্রতিপত্তি জীবন যৌবন তোমারি জন্যে। প্রতিদিন যদি বা ভুলে থাকি, আজ একদিন অন্ততঃ বলি, তোমারি জন্য আমার এই জীবন

হে স্বামী! তোমাকে না দিয়ে কি আমি আমাকে ব্যর্থ করলেম? না, তোমাকেই ব্যর্থ করলেম। তুমি যে বলেছিলে আমরা অমৃতস্য পুত্রাঃ, আমরা অমৃতের পুত্র। তুমি যে বলেছিলে তুমি বড়, তোমার জীবন সংসারের সুখের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে থাক্‌বে না। সেই পিতৃসত্য যে আমাদের পালন কর্‌তেই হবে, তাকে ব্যর্থ করলে যে তোমার সত্যকেই ব্যর্থ করা হবে।

সেই জন্যে, সেই সত্যকে স্বীকার করবে বলে এক একটা দিনকে মানুষ পৃথক করে রাখে। সে বলে রোজ তো ঘানি টেনেছি, আর পারিনে—একটা দিন অন্ততঃ বুঝি যে আনন্দ লোকে অমৃত লোকেই আমি জন্মগ্রহণ করেছি, কারাগারের মধ্যে নয়। সেই দিন উৎসবের দিন, সেই দিন মানুষের আপনার সত্যকে জান্‌বার দিন। সেই দিনকে প্রতিদিনকার দিন কর্‌তে হবে। প্রতিদিন

নিজেকে কত অসত্য করে দেখেছি, কত অসত্য করে জেনেছি—একদিন আপনাকে অনন্তের মধ্যে দেখে নিতে হবে। বিশ্বের বিধাতা হয়েও তুমি আমার পিতা—পিতা নোঽসি—এত বড় কথা একদিন সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জানাতেই হবে। আজ ধন মান খ্যাতি প্রতিপত্তির কাছে প্রণাম নয়, প্রতিদিন সেইখানে মাথা লুটিয়েছি এবং সেই ধূলি জঞ্জালের নীচে কোন্ তলায় তলিয়ে গিয়েছি। আজ সমস্ত জঞ্জাল দূর করে দিয়ে যিনি আমার দরজায় যুগ যুগ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁকে ডাক্‌ব—পিতা নোঽসি তুমি আমার পিতা। যে দিন তাঁকে ডাকব তাঁকে ঘরে নিয়ে আস্‌ব সে দিন সব ধন মান সার্থক হবে, সে দিন কোন অভাবই আর অভাব থাক্‌বে না।

মানুষ একদিন ভেবেছিল সে স্বর্গে যাবে, সেই চিন্তায় সে তীর্থে তীর্থে ঘুরেছে, সে

ব্রাহ্মণের পদধূলি নিয়েছে, সে কত ব্রত অনুষ্ঠান করেছে—কি কর্‌লে সে স্বর্গলোকের অধিকারী হতে পারে এই কথাই তার মনে জেগেছে। কিন্তু স্বর্গ তো কোথাও নেই। তিনি তো স্বর্গ কোথাও রাখেন নি। তিনি মানুষকে বলেচেন, তোমাকে স্বর্গ তৈরি কর্‌তে হবে। এই সংসারকেই তোমায় স্বর্গ কর্‌তে হবে। সংসারে তাঁকে আন্‌লেই যে সংসার স্বর্গ হয়। এত দিন মানুষ এ কোন্ শূন্যতার ধ্যান করেছে? সে সংসারকে ত্যাগ করে কেবলি দূরে দূরে গিয়ে নিষ্ফল আচার বিচারের মধ্যে এ কোন্ স্বর্গকে চেয়েচে? তার ঘর-ভরা শিশু, তার মা বাপ ভাই বন্ধু, আত্মীয় প্রতিবেশী—এদের সকলকে নিয়ে নিজের সমস্ত জীবনখানি দিয়ে যে তাকে স্বর্গ তৈরি কর্‌তে হবে। কিন্তু সে সৃষ্টি কি একলা হবে? না তিনি বলেছেন, তোমাতে আমাতে মিলে স্বর্গ করব—আর সব আমি একলা করেচি, কিন্তু তোমার জন্যেই

আমার স্বর্গ সৃষ্টি অসমাপ্ত রয়ে গেচে। তোমার ভক্তি তোমার আত্মনিবেদনের অপেক্ষায় এত বড় একটা চরমসৃষ্টি হতে পারেনি। সর্ব্ব-শক্তিমান এই জায়গায় তাঁর শক্তিকে খর্ব্ব করেচেন, একজায়গায় তিনি হার মেনেচেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাঁর সকলের চেয়ে দুর্ব্বল সন্তান তার সব উপকরণ হাতে করে নিয়ে আস্‌বে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্বর্গরচনাই অসম্পূর্ণ রইল। এই জন্যে যে তিনি যুগযুগান্ত ধরে অপেক্ষা করচেন। তিনি কি এই পৃথিবীর জন্যেই কত কাল ধরে অপেক্ষা করেন নি? আজ যে এই পৃথিবী এমন সুন্দরী এমন শস্য-শ্যামলা হয়েচে কত বাষ্পদহনের ভিতর দিয়ে ক্রমশ শীতল হয়ে তরল হয়ে তার পরে ক্রমে ক্রমে এই পৃথিবী কঠিন হয়ে উঠেচে, তখন তার বক্ষে এমন আশ্চর্য্য শ্যামলতা দেখা দিয়েছে। পৃথিবী যুগ যুগ ধরে তৈরি হয়েচে, কিন্তু স্বর্গ এখনো বাকি। বাষ্প আকারে

যখন পৃথিবী ছিল তখন তো এমন সৌন্দর্য্য ফোটেনি। আজ নীলাকাশের নীচে পৃথিবীর কি অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখা দিয়েচে। ঠিক্ তেমনি স্বর্গলোক বাষ্প আকারে আমাদের হৃদয়ের ভিতরে ভিতরে রয়েচে, তা আজও দানা বেঁধে ওঠেনি। তাঁর সেই রচনা কার্য্যে তিনি আমাদের সঙ্গে বসে গিয়েচেন, কিন্তু আমরা কেবল খাব পরব সঞ্চয় করব এই বলে বলে সমস্ত ভুলে বসে রইলুম। তবু এ ভুল্ তো ভাঙবে, মরবার আগে একদিন তো বলতে হবে, এই পৃথিবীতে এই জীবনে আমি স্বর্গের একটুখানি আভাস রেখে গেলেম। কিছু মঙ্গল রেখে গেলমে। অনেক অপরাধ স্তূপাকার হয়েছে, অনেক সময় ব্যর্থ করেচি, তবু ক্ষণে ক্ষণে একটু সৌন্দর্য্য ফুটেছিল। জগৎসংসারকে কি একেবারেই বঞ্চিত করে গেলেম? অভাবকে তো কিছু পূরণ করেচি, কিছু অজ্ঞান দূর করেচি—এই কথাটি তো

বলে যেতে হবে। এ দিন যাবে। এই আলো চোখের উপর মিলিয়ে যাবে। সংসার তার দরজা বন্ধ করে দেবে, তার বাইরে পড়ে থাক্‌ব। তার আগে কি বলে যেতে পারব না, কিছু দিতে পেরেচি?

আমাদের সৃষ্টি কর্‌বার ভার যে স্বয়ং তিনি দিয়েচেন। তিনি যে নিজে সুন্দর হয়ে জগৎকে সুন্দর করে সাজিয়েচেন, এ নিয়ে তো মানুষ খুসী হয়ে চুপ করে থাক্‌তে পার্‌ল না। সে বল্‌লে, আমি ঐ সৃষ্টিতে আরো কিছু সৃষ্টি করব। শিল্পী কি করে? সে কেন শিল্প রচনা করে? বিধাতা বলেচেন, আমি এই যে উৎসবের লণ্ঠন সব আকাশে ঝুলিয়ে দিয়েছি, তুমি কি আল্‌পনা আঁক্‌বে না? আমার রসুনচৌকি তো বাজ্‌চেই—তোমার তম্বুরা, কি একতারাই না হয় তুমি বাজাবে না? সে বল্লে হাঁ, বাজাব বৈ কি! গায়কের গানে আর বিশ্বের প্রাণে যেম্‌নি মিল্‌ল অম্‌নি ঠিক্ গানটি

হল। আমি গান সৃষ্টি করব বলে সেই গান তিনি শোনবার জন্তে আপনি এসেচেন। তিনি খুসী হয়েচেন—মানুষের মধ্যে তিনি যে আনন্দ দিয়েচেন প্রেম দিয়েচেন তা যে মিলল তাঁর সব আনন্দের সঙ্গে—এই দেখে তিনি খুসী। শিল্পী আমাদের মানুষের সভায় কি তার শিল্প দেখাতে এসেচে? সে যে তাঁরি সভায় তার শিল্প দেখাচ্চে, তার গান শোনাচ্চে। তিনি বললেন—বাঃ এ যে দেখছি আমার সুর শিখেচে, তাতে আবার আধ আধ বাণী জুড়ে দিয়েচে—সেই বাণীর আধখানা ফোটে আধখানা ফোটে না। তাঁর সুরে সেই আধফোটা সুর মিলিয়েচি শুনে তিনি বললেন—খুসি হয়েচি। এই যে তাঁর মুখের খুসি না দেখতে পেলে সে শিল্পী নয়, সে কবি নয়, সে গায়ক নয়। যে মানুষের সভায় দাঁড়িয়ে মানুষ কবে জয়মাল্য দেবে এই অপেক্ষায় বসে আছে সে কিছুই নয়। কিন্তু শিল্পী কেবলমাত্র রেখার

সৌন্দর্য্য নিল, কবি সুর নিল, রস নিল। এরা কেউই সব নিতে পারল না। সব নিতে পারা যায় একমাত্র সমস্ত জীবন দিয়ে। তাঁরি জিনিস তাঁর সঙ্গে মিলে নিতে হবে।

জীবনকে তাঁর অমৃতরসে কাণায় কাণায় পূর্ণ করে যে দিন নিবেদন করতে পারব সেদিন জীবন ধন্য হবে। তার চেয়ে বড় নিবেদন আর কি আছে? আমরা তো তা পারি না। তাঁর নৈবেদ্য থেকে সমস্ত চুরি করি, কৃপণতা করে বলি নিজের জন্য সবই নেব কিন্তু তাঁকে দেবার বেলা উদ্বৃত্ত মাত্র দিয়ে নিশ্চিন্ত হব। তাঁকে সমস্ত নিবেদন করে দিতে পারলে সব দরকার ভরে যায়, সব অভাব পূর্ণ হয়ে যায়। তাই বলচি আজ সেই জীবনের পরিপূর্ণ নিবেদনের দিন। আজ বলবার দিন—তুমি আমাকে তোমার আসনের পাশে বসিয়েছিলে কিন্তু আমি ভুলেছিলুম, আমি সব জুড়ে নিজেই বসেছিলুম। তোমার সঙ্গে বসব এ গৌরব

ভুলে গেলুম! তোমাতে আমাতে মিলে বসবার যে অপরূপ সার্থকতা এ জীবনে কি তা হবে না? আজ এই কথা বলব—আমার আসন শূন্য রয়ে গেচে। তুমি এস, তুমি এস, তুমি এসে একে পূর্ণ কর! তুমি না এলে আমার এই গৌরবে কাজ কি, আমার ধূলোর মধ্যে ভিক্ষুকের মত পড়ে থাকা যে ভালো। হায় হায় ধূলো বালি নিঁয়ে বাস্তবিকই এই যে খেলা করচি এই কি আমার সৃষ্টি? এই সৃষ্টির কাজের জন্যেই কি আমার জীবনের এত আয়োজন হয়েছিল? মাঝে মাঝে কি পরম দুঃখে পরম আঘাতে এগুলো ভেঙে যায় নি? খেলাঘর একটু নাড়া দিলেই পড়ে যায়। কিন্তু তোমাতে আমাতে মিলে যে সৃষ্টি তা কি একটু ফুঁয়ে এমনি করে পড়ে যেতে পারে? খেলাঘর কত যত্ন করেই গড়ে তুলি, যেদিন আঘাত দিয়ে ভেঙে দেন সেদিন দেখিয়ে দেন যে তাঁকে বাদ দিয়ে একলা সৃষ্টি করবার কোনো

সাধ্য আমাদের নাই। সেদিন কেঁদে উঠে আবার ভুলি, আবার ছিদ্র ঢাকবার চেষ্টা করি —এমনি করে সব ব্যর্থ হয়ে যায়।

সব কৃত্রিমতা দূর করে দিয়ে আজ এক-দিনের জন্য দরজা খুলে ডাকি—হে আমার চিরদিনের অধীশ্বর, তোমাকে একদিনের জন্যেই ডাকলুম। এই জীবনে শেষ নয়, এই পৃথিবীতেও শেষ নয়, আমি যে তোমার দর্শনার্থে তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছি। ঘুরেই চলেছি দেখা মেলেনি। আজ সব রুদ্ধতার মধ্যে একটু ফাঁক করে দিলেম, দেখা দিয়ো। অপরাধ তুমি যদি ক্ষমা না কর, পরমানন্দের কণা একটিও যদি না দাও তবু একথা বলতে পারব না—ওগো আমি পারলুম না। আমি ক্লান্ত অক্ষম, দুর্ব্বল, আমি জবাব দিলুম, আমার সব পড়ে রইল—এ কথা বলব না। তোমার জন্য দুঃখ পেলেম এই কথা জানাবার সুখ যে তুমিই দেবে। দুঃখ আমার নিজের জন্য পেলে

খেদের অবসান থাকে না। হে বন্ধু, তোমার জন্য বড় দুঃখ পেয়েছি এ কথা বলবার অধিকার দাও। সমস্ত সংসারের দীর্ঘপথ দুঃখের বোঝা বয়ে এসেছি—আজ দিলুম তোমার পায়ে ফেলে। তুমি যে আনন্দ, তুমি যে অমৃত এই কথাটি আজ স্মরণ করব। সেই স্মরণ করবার দিনই এই মহোৎসবের দিন।

অসতো মা সদ্‌গময়। অসত্যে জড়িয়ে আছি, তোমার সঙ্গে মিললে তবে সত্য হব। তোমার সঙ্গে সত্যে মিলন হবে, জ্ঞানের জ্যোতিতে মিলন হবে। মৃত্যুর পথ মাড়িয়ে অমৃত লোকে মিলন হবে। বিশ্বজগৎকে তোমার প্রকাশ যেমন প্রকাশিত করচে তেমনি আমার জীবনকে করবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ

১১ই মাঘ, ১৩২০।

ছোট ও বড়

(১১ই মাঘ সায়ংকালে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত উপদেশ)

এই সংসারের মাঝখানে থেকে সংসারের সমস্ত তাৎপর্য্য খুঁজে পাই আর নাই পাই, প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্যে মানুষ ক্ষণকালের খেলা যেমন করেই খেলুক মানুষ আপনাকে সৃষ্টির মাঝখানে একটা খাপছাড়া ব্যাপার বলে মনে করতে পারে না। মানুষের বুদ্ধি ভালবাসা আশা আকাঙ্ক্ষা সমস্তের মধ্যেই মানুষের উপস্থিত প্রয়োজনের অতিরিক্ত এমন একটা প্রভূত বেগ আছে যে মানুষ নিজের জীবনের হিসাব করবার সময়, যা তার হাতে আছে তার চেয়ে অনেক বেশি জমা করে নেয়। মানুষ আপনার প্রতিদিনের হাত-খরচের খুচরো

তহবিলকেই নিজের মূলধন বলে গণ্য করে না। মানুষের সকল কিছুতেই যে-একটি চিরজীবনের উত্তম প্রকাশ পায় সে যে একটা অদ্ভুত বিড়ম্বনা, মরীচিকার মত সে যে কেবল জলকে দেখায় অথচ তৃষ্ণাকে বহন করে এ কথা সমস্ত মনের সঙ্গে সে বিশ্বাস করতে পারে না।

ভোগী ভোগের মধুপাত্রের মধ্যে আপনার দুই ডানা জড়িয়ে ফেলে বসে আছে, বুদ্ধি-অভিমানী জোনাক-পোকার মত আপন পুচ্ছের আলোক-সীমার বাইরে আর সমস্তকেই অস্বীকার করচে, অলসচিত্ত উদাসীন তার নিমীলিত চক্ষুপল্লবের দ্বারা আপনার মধ্যে একটি চিররাত্রি রচনা করে পড়ে আছে, তবু সমস্ত মত্ততা, অহঙ্কার এবং জড়ত্বের ভিতর দিয়ে মানুষ নানা দেশে নানা ভাষায় নানা আকারে প্রকাশ করবার চেষ্টা করচে যে আমার সত্য প্রতিষ্ঠা আছে, এবং সে প্রতিষ্ঠা এইটুকুর মধ্যে নয়।

সেই জন্যে আমরা যাঁকে দেখলুম না, যাঁকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ করলুম না, যাঁকে সংসার-বুদ্ধিটুকুর বেড়া দিয়ে ঘের দিয়ে রাখলুম না, তাঁর দিকে মুখ তুলে যাঁরা বল্লেন, তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ, এই তিনি পুত্র হতে প্রিয়, বিত্ত হতেও প্রিয়, অন্য সব কিছু হতেও প্রিয়, তাঁদের সেই বাণীকে আমাদের জীবনের ব্যবহারে সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে না পেরেও আজ পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করতে পারলুম না। এই জন্যে যখন আমরা তাঁর ভক্তকে দেখলুম তিনি কোন্ অন্তহীনের প্রেমে জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তকে মধুময় করে বিকশিত করচেন, যখন তাঁর সেবককে দেখলুম তিনি বিশ্বের কল্যাণে প্রাণকে তুচ্ছ এবং দুঃখ-অপমানকে গলার হার করে তুলচেন তখন তাঁদের প্রণাম করে আমরা বল্লুম এইবার মানুষকে দেখা গেল।

সমস্ত বৈষয়িকতা, সমস্ত দ্বেষ বিদ্বেষ ভাগ

বিভাগের মাঝখানে এইটি ঘটচে—কিছুতেই এটিকে আর চাপা দিতে পারলে না। মানুষের মধ্যে এই যে অনন্তের বিশ্বাস, এই যে অমৃতের আশ্বাসটি বীজের মত রয়েচে বারম্বার দলিত বিদলিত হয়েও সে মরল না। এ যদি শুধু তর্কের সামগ্রী হোত তবে তর্কের আঘাতে আঘাতে চূর্ণ হয়ে যেত, কিন্তু এ যে মর্ম্মের জিনিষ, মানুষের সমস্ত প্রাণের কেন্দ্রস্থল থেকে এ যে অনির্ব্বচনীয় রূপে আপনাকে প্রকাশ করে।

তাই ত ইতিহাসে দেখা গেচে মানুষের চিত্ত-ক্ষেত্রে এক একবার শত বৎসরের অনাবৃষ্টি ঘটেচে, অবিশ্বাসের কঠিনতায় তার অনন্তের চেতনাকে আবৃত করে দিয়েচে, ভক্তির রসসঞ্চয় শুকিয়ে গেচে, যেখানে পূজার সঙ্গীত বেজে উঠত, সেখানে উপহাসের অট্টহাস্য জেগে উঠচে। শত বৎসরের পরে আবার বৃষ্টি নেমেচে, মানুষ বিস্মিত হয়ে দেখেচে সেই

মৃত্যুহীন বীজ আবার নূতন তেজে অঙ্কুরিত হয়ে উঠেচে।

মাঝে মাঝে যে শুষ্কতার ঋতু আসে তারও প্রয়োজন আছে, কেন না বিশ্বাসের প্রচুর রস পেয়ে যখন বিস্তর আগাছা কাঁটাগাছ জন্মায়, যখন তারা আমাদের ফসলের সমস্ত জায়গাটি ঘন করে জুড়ে বসে আমাদের চলবার পথটি রোধ করে দেয়, যখন তারা কেবল আমাদের বাতাসকে বিষাক্ত করে কিন্তু আমাদের কোনো খাদ্য যোগায় না, তখন খররৌদ্রের দিনই শুভ-দিন—তখন অবিশ্বাসের তাপে যা মরবার তা শুকিয়ে মরে যায়, কিন্তু যার প্রাণ আমাদের প্রাণের মধ্যে, সে মরবে তখনি যখন্ আমরা মরব ; যতদিন আমরা আছি ততদিন আমাদের আত্মার খাদ্য আমাদের সংগ্রহ করতেই হবে—মানুষ আত্মহত্যা করবে না।

এই যে মানুষের মধ্যে একটি অমৃতলোক আছে যেখানে তার চিরদিনের সমস্ত সঙ্গীত

বেজে উঠচে আজ আমাদের উৎসব সেই-খানকার। এই উৎসবের দিনটি কি আমাদের প্রতিদিন হতে স্বতন্ত্র? এই যে অতিথি আজ গলায় মালা পরে, মাথায় মুকুট নিয়ে এসেচে এ কি আমাদের প্রতিদিনের আত্মীয় নয়?

আমাদের প্রতিদিনেরই পর্দ্দার আড়ালে আমাদের উৎসবের দিনটি বাস করচে। আমাদের দৈনিক জীবনের মধ্যে অন্তঃসলিলা হয়ে একটি চিরজীবনের ধারা বয়ে চলেচে, সে আমাদের প্রতিদিনকে অন্তরে অন্তরে রস-দান করতে করতে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হচ্চে; সে ভিতর থেকে আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে উদার করচে, সমস্ত ত্যাগকে সুন্দর করচে, সমস্ত প্রেমকে সার্থক করচে। আমাদের সেই প্রতিদিনের অন্তরের রসস্বরূপকে আজ আমরা প্রত্যক্ষরূপে বরণ করব বলেই এই উৎসব—এ আমাদের জীবনের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন নয়। সম্বৎসরকাল গাছ আপনার

পাতার ভার নিয়েই ত আছে; বসন্তের হাওয়ায় একদিন তার ফুল ফুটে ওঠে; সেই দিন তার ফলের খবরটি প্রকাশ হয়ে পড়ে। সেই দিন বোঝা যায় এতদিনকার পাতা ধরা এবং পাতা ঝরার ভিতরে এই সফলতার প্রবাহটি বরাবর চলে আসছিল, সেই জন্যেই ফুলের উৎসব দেখা দিল, গাছের অমরতার পরিচয় সুন্দর বেশে প্রচুর ঐশ্বর্য্যে আপনাকে প্রকাশ করল।

আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সেই পরমোৎসবের ফুল কি আজ ধরেচে, তার গন্ধ কি আমরা অন্তরের মধ্যে আজ পেয়েচি? আজ কি অন্য সব ভাবনার আড়াল থেকে এই কথাটি আমাদের কাছে স্পষ্ট করে দেখা দিল যে জীবনটা কেবল প্রাত্যহিক প্রয়োজনের কর্ম্ম-জাল বুনে বুনে চলা নয়—তার গভীরতার ভিতর থেকে একটি পরম সৌন্দর্য্য পরমকল্যাণ পূজার অঞ্জলির মত ঊর্দ্ধমুখ হয়ে উঠচে?

না, সে কথা ত আমরা সকলে মানিনে। আমাদের জীবনের মর্ম্মনিহিত সেই সত্যকে সুন্দরকে দেখবার দিন এখনো হয় ত আসেনি। আপনাকে একেবারে ভুলিয়ে দেয়, সমস্ত স্বার্থকে পরমার্থের মধ্যে মিলিয়ে তোলে এমন বৃহৎ আনন্দের হিল্লোল অন্তরের মধ্যে জাগেনি; —কিন্তু তবুও তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে অন্ততঃ একটি দিনকেও আমরা পৃথক করে রাখি, আমাদের সমস্ত অন্যমনস্কতার মাঝখানেই আমাদের পূজার প্রদীপটি জ্বালি, আসনটি পাতি, সকলকে ডাকি, যে যেমন ভাবে আসে আসুক, যে যেমন ভাবে ফিরে যায় ফিরে যাক।

কেননা, এ ত আমাদের কারো একলার সামগ্রী নয়। আজ আমাদের কণ্ঠ হতে যে স্তবসঙ্গীত উঠবে সে ত কারো একলা-কণ্ঠের বাণী নয়; জীবনের পথে সম্মুখের দিকে যাত্রা করতে করতে মানুষ নানা ভাষায় যাঁর নাম ডেকেচে, যে নাম তার সংসারের সমস্ত

কলরবের উপরে উঠেচে আমরা সেই সকল—মানুষের কণ্ঠের চিরদিনের নামটি উচ্চারণ করতে আজ এখানে একত্র হয়েচি—কোনো পুরস্কার পাবার আশায় নয়, কেবল এই কথাটি বলবার জন্যে—যে, তাঁকে আমরা আপনার ভাষায় ডাকতে শিখেচি মানুষের এই একটি আশ্চর্য্য সৌভাগ্য। আমরা পশুরই মত আহার বিহারে রত, আপন আপন ভাগ নিয়ে আমাদের টানাটানি, তবু তারি মধ্যেই "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্" আমরা সেই মহান্ পুরুষকে জেনেচি, সমস্ত মানুষের হয়ে এই কথাটি স্বীকার করবার জন্যেই উৎসবের আয়োজন।

অথচ আমরা যে সুখসম্পদের কোলে বসে আরামে আছি তাই আনন্দ করচি তা নয়। দ্বারে মৃত্যু এসেচে, ঘরে দারিদ্র্য; বাইরে বিপদ অন্তরে বেদনা; মানুষের চিত্ত সেই ঘন অন্ধকারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলেচে,

"বেদাহমেতঃ পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃপরস্তাৎ"—আমি সেই মহান্ পুরুষকে জেনেচি, যিনি অন্ধকারের পরপার হতে জ্যোতির্ম্ময়রূপ প্রকাশ পাচ্চেন। মনুষ্যত্বের তপস্যা সহজ তপস্যা হয় নি, সাধনার দুর্গম পথ দিয়ে রক্তমাখা পায়ে মানুষকে চলতে হয়েচে, তবু মানুষ আঘাতকে দুঃখকে আনন্দ বলে গ্রহণ করেচে, মৃত্যুকে অমৃত বলে বরণ করেচে, ভয়ের মধ্যে অভয়কে ঘোষণা করেচে এবং রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং, হে রুদ্র, তোমার যে প্রসন্নমুখ সেই মুখ মানুষ দেখতে পেয়েচে। সে দেখা ত সহজ নয়, সমস্ত অভাবকে পরিপূর্ণ করে দেখা, সমস্ত সীমাকে অতিক্রম করে দেখা। মানুষ সেই দেখা দেখেচে বলেই ত তার সকল কান্নার অশ্রুজলের উপরে তার গৌরবের পদ্মটি ভেসে উঠেচে তার দুঃখের হাটের মাঝখানে তার এই আনন্দ-সম্মিলন।

কিন্তু বিমুখ চিত্তও আছে, এবং বিরুদ্ধ বাক্যও শোনা যায়। এমন কোন মহৎ সম্পৎ মানুষের কাছে এসেছে যার সম্মুখে বাধা তার পরিহাসকুটিল মুখ নিয়ে এসে দাঁড়ায় নি? তাই এমন কথা শুনি, অনন্তকে নিয়ে ত আমরা উৎসব করতে পারিনে, অনন্ত যে আমাদের কাছে তত্ত্বকথা মাত্র। বিশ্বের মধ্যে তাঁকে ব্যাপ্ত করে দেখব, কিন্তু লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মধ্যে যে বিশ্ব নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, যে বিশ্বের নাড়ীতে নাড়ীতে আলোকধারার আবর্ত্তন হয়ে কত শত শত বৎসর কেটে যায় সে বিশ্ব আমার কাছে আছে কোথায়? তাই ত সেই অনন্ত পুরুষকে নিজের হাত দিয়ে নিজের মত করে ছোট করে নিই নইলে তাঁকে নিয়ে আমাদের উৎসব করা চলে না।

এমনি করে তর্কের কথা এসে পড়ে। যখন উপভোগ করিনে, যখন সমস্ত প্রাণকে জাগিয়ে দিয়ে উপলব্ধি করিনে তখনই কলহ

করি। ফুলকে যদি প্রদীপের আলোয় ফুটতে হত তাহলেই তাকে প্রদীপ খুঁজে বেড়াতে হত কিন্তু যে সূর্য্যের আলো আকাশময় ছড়িয়ে ফুল যে সেই আলোয় ফোটে, এইজন্যে তার কাজ কেবল আকাশে আপনাকে মেলে ধরা। আপন ভিতরকার প্রাণের বিকাশবেগেই সে আপনার পাপড়ির অঞ্জলিটিকে আলোর দিকে পেতে দেয়, তর্ক করে পণ্ডিতের সঙ্গে পরামর্শ করে এ কাজ করতে গেলে দিন বয়ে যেত। হৃদয়কে একান্ত করে অনন্তের দিকে পেতে ধরা মানুষের মধ্যেও দেখেছি, সেইখানেই ত ঐ বাণী উঠেচে, বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃপরস্তাৎ, আমি সেই মহান্ পুরুষকে দেখেছি যিনি অন্ধকারের পরপার হতে জ্যোতির্ম্ময়রূপে প্রকাশ পাচ্চেন। এ ত তর্কযুক্তির কথা হল না—চোখ যেমন করে আপনার পাতা মেলে দেখে, এযে তেমনি করে জীবন মেলে দেখা।

সত্য হতে অবচ্ছিন্ন করে যেখানে তত্ত্ব-কথাকে বাক্যের মধ্যে বাঁধা হয় সেখানে তা নিয়ে কথা কাটাকাটি করা সাজে কিন্তু দ্রষ্টা যেখানে অনন্ত পুরুষকে সমস্ত সত্যেরই মাঝখানে দেখে বলেন—এষঃ, এই যে তিনি, সেখানে ত কোনো কথা বলা চলে না। "সীমা" শব্দটার সঙ্গে একটা "না" লাগিয়ে দিয়ে আমরা "অসীম" শব্দটাকে রচনা করে সেই শব্দটাকে শূন্যাকার করে বৃথা ভাবতে চেষ্টা করি, কিন্তু অসীম ত "না" নন, তিনি যে নিবিড় নিরবচ্ছিন্ন "হাঁ"—তাই ত তাঁকে ওঁ বলে ধ্যান করা হয়—ওঁ যে হাঁ, ওঁ যে যা কিছু আছে সমস্তকে নিয়ে অখণ্ড পরিপূর্ণতা। আমাদের মধ্যে প্রাণ জিনিসটি যেমন—কথা দিয়ে যদি তাকে ব্যাখ্যা করতে যাই তবে দেখি প্রতি মুহূর্তেই তার ধ্বংস হচ্ছে, সে যেন মৃত্যুর মালা; কিন্তু তর্ক না করে আপনার ভিতরকার সহজবোধ দিয়ে যদি দেখি তবে দেখতে পাই

আমাদের প্রাণ তার প্রতিমুহূর্তের মৃত্যুকে অতিক্রম করে রয়েচে, মৃত্যুর "না" দিয়ে তার পরিচয় হয় না, মৃত্যুর মধ্যে সেই প্রাণই হচ্চে "হাঁ"।

সীমার মধ্যে অসীম হচ্চেন তেমনি ওঁ। তর্ক না করে উপলব্ধি করে দেখলেই দেখা যায় সমস্ত চলে যাচ্চে সমস্ত স্খলিত হচ্চে বটে কিন্তু একটি অখণ্ডতার বোধ আপনিই থেকে যাচ্চে, সেই অখণ্ডতার বোধের মধ্যেই আমরা সমস্ত পরিবর্ত্তন সমস্ত গতায়াতসত্ত্বেও বন্ধুকে বন্ধু বলে জানচি; নিরন্তর সমস্ত চলে যাওয়াকে পেরিয়ে থেকে-যাওয়াটাই আমাদের বোধের মধ্যে বিরাজ করচে। বন্ধুকে বাইরের বোধের মধ্যে আমরা খণ্ড খণ্ড করে দেখচি, কখনো আজ কখনো পাঁচদিন পরে, কখনো এক ঘটনায় কখনো অন্য ঘটনায়, তাঁর সম্বন্ধে আমার বাইরের বোধটাকে জড়ো করে দেখলে তার পরিমাণ অতি অল্পই হয়, অথচ অন্তরের

মধ্যে তার সম্বন্ধে যে একটি নিরবচ্ছিন্ন বোধের উদয় হয়েছে তার পরিমাণের আর অন্ত নেই, সে আমার সমস্ত প্রত্যক্ষ জানার কূল ছাপিয়ে কোথায় চলে গেচে ; যে কাল গত সে কালও তাকে ধরে রাখেনি, যে কাল সমাগত সে কালও তাকে ঠেকিয়ে রাখে নি, এমন কি, মৃত্যুও তাকে আবদ্ধ করেনি। বরঞ্চ আমার বন্ধুকে ক্ষণে ক্ষণে ঘটনায় ঘটনায় যে ফাঁক ফাঁক করে দেখেচি সেই সীমাবচ্ছিন্ন দেখাগুলিকে সুনির্দ্দিষ্টভাবে মনে আনতে চাইলে মন হার মানে—কিন্তু সমস্ত খণ্ড জানার সীমাকে সকল দিকে পেরিয়ে গিয়ে আমার বন্ধুর যে একটি পরম অনুভূতি অসীমের মধ্যে নিরন্তরভাবে উপলব্ধ হয়েছে সেইটেই সহজ, কেবল সহজ নয়, সেইটেই আনন্দময়। আমাদের প্রিয়-জনের সমস্ত অনিত্যতার সীমা পূরণ করে তুলেছে এমন একটি চিরন্তনকে যেমন অনায়াসে যেমন আনন্দে আমরা দেখি তেমনি

করেই যাঁরা আপনার সহজ বিপুল বোধের দ্বারা সংসারের সমস্ত চলার ভিতরকার অসীম থাকাটিকে একান্ত অনুভব করেচেন, তাঁরাই বলেচেন, এষাস্য পরমাগতিঃ, এষাস্য পরমাসম্পৎ এষোঽস্য পরমোলোকঃ, এষোঽস্য পরম আনন্দঃ। এ ত জ্ঞানীর তত্ত্বকথা নয়, এ যে আনন্দের নিবিড় উপলব্ধি! এষঃ, এই যে ইনি, এই যে অত্যন্ত নিকটের ইনি, ইনিই জীবের পরমাগতি, পরমধন, পরম আশ্রয়, পরম আনন্দঃ—তিনি একদিকে যেমন গতি আর একদিকে তেমনি আশ্রয়, একদিকে যেমন সাধনার ধন, আর একদিকে তেমনি সিদ্ধির আনন্দ।

কিন্তু আমাদের লৌকিক বন্ধুকে আমরা অসীমতার মধ্যে উপলব্ধি করচি বটে তবু সীমার মধ্যেই তার প্রকাশ, নইলে তার সঙ্গে আমার-কোনো সম্বন্ধই থাকত না। অতএব অসীম ব্রহ্মকে আমাদের নিজের উপকরণ দিয়ে নিজের কল্পনা দিয়ে আগে নিজের মত

গড়ে নিতে হবে তার পরে তাঁর সঙ্গে আমাদের ব্যবহার চলতে পারে এমন কথা বলা হয়ে থাকে।

কিন্তু আমার বন্ধুকে যেমন আমার নিজের হাতে গড়তে হয় নি এবং যদি গড়তে হত তাহলে কখনই তার সঙ্গে আমার সত্য বন্ধুত্ব হত না, বন্ধুর বাহিরের প্রকাশটি আমার চেষ্টা আমার কল্পনার নিরপেক্ষ,—তেমনি অনন্ত-স্বরূপের প্রকাশ ও ত আমার সংগ্রহ করা উপকরণের অপেক্ষা করে নি, তিনি অনন্ত বলেই আপনার স্বাভাবিক শক্তিতেই আপনাকে প্রকাশ করচেন। যখনি তিনি আমাদের মানুষ করে সৃষ্টি করচেন তখনি তিনি আপনাকে আমাদের অন্তরে বাহিরে মানুষের ধন করে ধরা দিয়েচেন, তাঁকে রচনা করবার বরাৎ তিনি আমাদের উপরে দেন নি। প্রভাতের অরুণ আভা ত আমারই, বনের শ্যামল শোভা ত আমারই, ফুল যে ফুটেচে,

সে কার কাছে ফুটেচে ? ধরণীর বীণাযন্ত্রে যে নানা সুরের সঙ্গীত উঠেছে, সে সঙ্গীত কার জন্যে ? আর এই ত রয়েছে মায়ের কোলের শিশু, বন্ধুর দক্ষিণহস্ত-ধরা বন্ধু, এই ত ঘরে বাহিরে যাদের ভালবেসেছি সেই আমার প্রিয়জন ; এদের মধ্যে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রসারিত হচ্চে এই আনন্দ যে আমার আনন্দময়ের নিজের হাতের পাতা আসন ; এই আকাশের নীল চাঁদোয়ার নীচে, এই জননী পৃথিবীর বিচিত্র আলপনা-আঁকা বরণ-বেদিটির উপরে আমার সমস্ত আপন লোকের মাঝখানে সেই সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপে অমৃতরূপে বিরাজ করচেন।

এই সমস্ত থেকে, এই তাঁর আপনার আত্মদান থেকে অবচ্ছিন্ন করে নিয়ে কোন্ কল্পনা দিয়ে গড়ে কোন্ দেয়ালের মধ্যে তাঁকে স্বতন্ত্র করে ধরে রেখে দেব ? সেই কি হবে আমাদের কাছে সত্য, আর যিনি অন্তর বাহির

ভরে দিয়ে নিত্য নবীন শোভায় চিরসুন্দর হয়ে বসে রয়েছেন তিনিই হবেন তত্ত্বকথা? তাঁরই এই আপন আনন্দনিকেতনের প্রাঙ্গণে আমরা তাঁকে ঘিরে বসে অহোরাত্র খেলা করলুম, তবু এইখানে এই সমস্তর মাঝখানে আমাদের হৃদয় যদি জাগল না, আমরা তাঁকে যদি ভালবাসতে না পারলুম তবে জগৎজোড়া এই আয়োজনের দরকার কি ছিল? তবে কেন এই আকাশের নীলিমা, অমারাত্রির অবগুণ্ঠনের উপরে কেন এই সমস্ত তারার চুমকি বসানো, তবে কেন বসন্তের উত্তরীয় উড়ে এসে ফুলের গন্ধে দক্ষিণে হাওয়াকে উতলা করে তোলে? তবে ত বলতে হয় সৃষ্টি বৃথা হয়েছে, অনন্ত যেখানে নিজে দেখা দিচ্ছেন সেখানে তাঁর সঙ্গে মিলন হবার কোনো উপায় নেই। বলতে হয় যেখানে তাঁর সদাব্রত সেখানে আমাদের উপবাস ঘোচে না, মা যে অন্ন স্বহস্তে প্রস্তুত করে নিয়ে বসে আছেন

সন্তানের তাতে তৃপ্তি নেই, আর ধূলোবালি নিয়ে খেলার অন্ন যা সে নিজে রচনা করেচে তাইতে তার পেট ভরবে।

না, এ কেবল সেই সকল দুর্ব্বল উদাসীনদের কথা—যারা পথে চলবে না এবং দূরে বসে বসে বলবে পথে চলাই যায় না। একটি ছেলে নিতান্ত একটি সহজ কবিতা আবৃত্তি করে পড়ছিল; আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম তুমি যে কবিতাটি পড়লে তাতে কি বলেচে, তার থেকে তুমি কি বুঝলে? সে বল্লে সে কথা ত আমাদের মাষ্টার মশায় বলে দেয় নি। ক্লাসে পড়া মুখস্থ করে তার একটা ধারণা হয়ে গেচে যে কবিতা থেকে নিজের মন দিয়ে বোঝবার কিছুই নেই। মাষ্টার মশায় তাকে ব্যাকরণ অভিধান সমস্ত বুঝিয়েছে কেবল এই কথাটি বোঝায় নি যে রসকে নিজের হৃদয় দিয়েই বুঝতে হয় মাষ্টারের বোঝা দিয়ে বুঝতে হয় না। সে মনে করেছে বুঝতে

পারার মানে একটা কথার জায়গায় আর একটা কথা বসানো, "সুশীতল" শব্দের জায়গায় "সুস্নিগ্ধ" শব্দ প্রয়োগ করা। এ পর্য্যন্ত মাষ্টার তাকে ভরসা দেয় নি, তার মনের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অপহরণ করেচে, যেখানে বোঝা তার পক্ষে নিতান্ত সহজ সেখানেও বুঝতে পারে বলে তার ধারণাই হয় নি; এইজন্যে ভয়ে ভয়ে সে আপনার স্বাভাবিক শক্তিকে খাটায় না—সেও বলে আমি বুঝিনে, আমরাও বলি সে বোঝে না। এলাহাবাদ সহরে যেখানে গঙ্গা যমুনা দুই নদী একত্র মিলিত হয়েচে সেখানে ভূগোলের ক্লাসে যখন একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল নদী জিনিষটা কি, তুমি কখনো কি দেখেচ? সে বল্লে, না। ভূগোলের নদী জিনিষটার সংজ্ঞা সে অনেক মার খেয়ে শিখেচে, এ কথা মনে করতে তার সাহসই হয় নি যে, যে নদী দুইবেলা সে চক্ষে দেখেচে, যার মধ্যে সে আনন্দে স্নান করেছে সেই নদীই

তার ভূগোলবিবরণের নদী, তার বহু দুঃখের এগজামিন পাসের নদী।

তেমনি করেই আমাদের ক্ষুদ্র পাঠশালার মাষ্টার মশায়রা কোনোমতেই এ কথা আমাদের জানতে দেয় না যে, অনন্তকে একান্তভাবে আপনার মধ্যে এবং সমস্তের মধ্যে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করা যায়। এই জন্যে অনন্তস্বরূপ যেখানে আমাদের ঘর ভরে পৃথিবী জুড়ে আপনি দেখা দিলেন সেখানে আমরা বলে বসলুম, বুঝতে পারি নে, দেখতে পেলুম না। ওরে বোঝবার আছে কি? এই যে এবং, এই যে এই। এই যে চোখ জুড়িয়ে গেল, প্রাণ ভরে গেল, এই যে বর্ণে গন্ধে গীতে নিরন্তর আমাদের ইন্দ্রিয়বীণায় তাঁর হাত পড়চে, এই যে স্নেহে প্রেমে সখ্যে আমাদের হৃদয়ে কত রং ধরে উঠচে, কত মধু ভরে উঠচে; এই যে দুঃখরূপ ধরে অন্ধকারের পথ দিয়ে পরম কল্যাণ আমাদের জীবনের

সিংহদ্বারে এসে আঘাত করচেন, আমাদের সমস্ত প্রাণ কেঁপে উঠচে, বেদনায় পাষাণ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্চে; আর ঐ যে তাঁর বহু অশ্বের রথ, মানুষের ইতিহাসের রথ, কত অন্ধকারময় নিস্তব্ধ রাত্রি এবং কত কোলাহলময় দিনের ভিতর দিয়ে বন্ধুর-পন্থায় যাত্রা করেচে, তাঁর বিদ্যুৎশিখাময়ী কশা মাঝে মাঝে আকাশে ঝল্‌কে ঝল্‌কে উঠচে—এই ত এষঃ, এই ত এই। সেই এইকে সমস্ত জীবন মন দিয়ে আপন করে জানি, প্রত্যহ প্রতিদিনের ঘটনার মধ্যে স্বীকার করি এবং উৎসবের দিনে বিশ্বের বাণীকে বিজয়কণ্ঠে নিয়ে তাঁকে ঘোষণা করি—সেই সত্যংজ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম, সেই শান্তংশিবমদ্বৈতং, সেই কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ, সেই যে এক অনেকের প্রয়োজন গভীর ভাবে পূর্ণ করচেন, সেই যে অন্তহীন, জগতের আদি অন্তে পরিব্যাপ্ত, সেই যে মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ

যাঁর সঙ্গে শুভযোগে আমাদের বুদ্ধি শুভবুদ্ধি হয়ে ওঠে।

নিখিলের মাঝখানে যেখানে মানুষ তাঁকে মানুষের সম্বন্ধে ডাকতে পারে—পিতামাতা বন্ধু—সেখান থেকে সমস্ত চিত্তকে প্রত্যাখ্যান করে যখন আমরা অনন্তকে ছোট করে আপন হাতে আপনার মত করে গড়েছি তখন কি যে করেছি তা কি ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট করে একবার দেখব না? যখন আমরা বলেছি আমাদের পরমধনকে সহজ করবার জন্যে ছোট করব তখনি আমাদের পরমার্থকে নষ্ট করেছি; তখন টুকরো কেবলি হাজার টুকরো হবার দিকে গেছে, কোথাও সে আর থামতে চায় নি; কল্পনা কোনো বাধা না পেয়ে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে; কৃত্রিম বিভীষিকায় সংসারকে কণ্টকিত করে তুলেচে; বীভৎস প্রথা ও নিষ্ঠুর আচার সহজেই ধর্ম্মসাধনা ও সমাজব্যবস্থার মধ্যে আপনার স্থান করে

নিয়েচে। আমাদের বুদ্ধি অন্তঃপুরচারিণী ভীরু রমণীর মত স্বাধীন বিচারের প্রশস্ত রাজপথে বেরতে কেবলি ভয় পেয়েচে। এই কথাটি আমাদের বুঝতে হবে যে অসীমের অভিমুখে আমাদের চলবার পন্থাটি মুক্ত না রাখলে নয়; থামার সীমাই হচ্চে আমাদের মৃত্যু, আরোর পরে আরোই হচ্চে আমাদের প্রাণ—সেই আমাদের ভূমার দিক্‌টি জড়তার দিক নয়, সহজের দিক নয়, সে দিক অন্ধ অনুসরণের দিক নয়, সেই দিক্ নিয়ত সাধনার দিক্—সেই মুক্তির দিক্‌কে মানুষ যদি আপন কল্পনার বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলে, আপনার দুর্ব্বলতাকেই লালন করে ও শক্তিকে অবমানিত করে তবে তার বিনাশের দিন উপস্থিত হয়।

এমনি করে মানুষ যখন সহজ করবার জন্যে আপনার পূজাকে ছোট করতে গিয়ে পূজনীয়কে এক প্রকার বাদ দিয়ে বসে, তখন পুনশ্চ সে এই দুর্গতি থেকে আপনাকে বাঁচাবার

ব্যগ্রতায় অনেক সময় আর এক বিপদে গিয়ে পড়ে—আপন পূজনীয়কে এতই দূরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখে সেখানে আমাদের পূজা পৌঁছতে পারে না, অথবা পৌঁছতে গিয়ে তার সমস্ত রস শুকিয়ে যায়। এ কথা তখন মানুষ ভুলে যায় যে, অসীমকে কেবলমাত্র ছোট করলেও যেমন তাঁকে মিথ্যা করা হয় তেমনি তাঁকে কেবলমাত্র বড় করলেও তাঁকে মিথ্যা করা হয়, তাঁকে শুধু ছোট করে আমাদের বিকৃতি, তাঁকে শুধু বড় করে আমাদের শুষ্কতা।

অনন্তং ব্রহ্ম, অনন্ত বলেই ছোট হয়েও বড় এবং বড় হয়েও ছোট। তিনি অনন্ত বলেই সমস্তকে ছাড়িয়ে আছেন এবং অনন্ত বলেই সমস্তকে নিয়ে আছেন। এইজন্যে মানুষ যেখানে মানুষ সেখানে ত তিনি মানুষকে ত্যাগ করে নেই। তিনি পিতামাতার হৃদয়ের পাত্র দিয়ে আপনিই আমাদের স্নেহ দিয়েছেন, তিনি মানুষের প্রীতির আকর্ষণ দিয়ে আপনিই

আমাদের হৃদয়ের গ্রন্থিমোচন করেছেন; এই পৃথিবীর আকাশেই তাঁর যে বীণা বাজে তারই সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের তার একসুরে বাঁধা; মানুষের মধ্য দিয়েই তিনি আমাদের সমস্ত সেবা গ্রহণ করচেন, আমাদের কথা শুনচেন এবং শোনাচ্চেন, এইখানেই সেই পুণ্যলোক সেই স্বর্গলোক যেখানে জ্ঞানে প্রেমে কর্ম্মে সর্ব্বতোভাবে তাঁর সঙ্গে আমাদের মিলন ঘটতে পারে। অতএব মানুষ যদি অনন্তকে সমস্ত মানবসম্বন্ধ হতে বিচ্যুত করে জানাই সত্য মনে করে তবে সে শূন্যতাকেই সত্য মনে করবে। আমরা মানুষ হয়ে জন্মেছি যখনি এ কথা সত্য হয়েচে তখনি এ কথাও সত্য, অনন্তের সঙ্গে আমাদের সমস্ত ব্যবহার এই মানুষের ক্ষেত্রেই, মানুষের বুদ্ধি, মানুষের প্রেম, মানুষের শক্তি নিয়েই। এইজন্যে ভূমার আরাধনায় মানুষকে দুটি দিক বাঁচিয়ে চলতে হয়। একদিকে নিজের মধ্যেই সেই ভূমার আরাধনা হওয়া চাই, আর এক-

দিকে অন্য আকারে সে যেন নিজেরই আরাধনা না হয়; একদিকে নিজের শক্তি নিজের হৃদয়বৃত্তিগুলি দিয়েই তাঁর সেবা হবে, আর একদিকে নিজেরই রিপুগুলিকে ধর্ম্মের রসে সিক্ত করে সেবা করবার উপায় করা যেন না হয়।

অনন্তের মধ্যে দূরের দিক এবং নিকটের দিক দুইই আছে; মানুষ সেই দূর ও নিকটের সামঞ্জস্যকে যে পরিমাণে নষ্ট করেচে সেই পরিমাণে ধর্ম্ম যে কেবল তার পক্ষে অসম্পূর্ণ হয়েচে তা নয় তা অকল্যাণ হয়েচে। এই-জন্যেই মানুষ ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে সংসারে যত দারুণ বিভীষিকার সৃষ্টি করেচে এমন সংসার-বুদ্ধির দোহাই দিয়ে নয়। আজ পর্য্যন্ত ধর্ম্মের নামে কত নরবলি হয়েচে এবং কত নরবলি হচ্চে তার আর সীমাসংখ্যা নেই। সে বলি কেবলমাত্র মানুষের প্রাণের বলি নয়, বুদ্ধির বলি, দয়ার বলি, প্রেমের বলি। আজ পর্য্যন্ত কত

দেবমন্দিরে মানুষ আপনার সত্যকে ত্যাগ করেচে, আপনার মঙ্গলকে ত্যাগ করেচে এবং কুৎসিতকে বরণ করেচে। মানুষ ধর্ম্মের নাম করেই নিজেদের কৃত্রিম গণ্ডীর বাইরের মানুষকে ঘৃণা করবার নিত্য অধিকার দাবী করেচে। মানুষ যখন হিংসাকে, আপনার প্রকৃতির রক্তপায়ী কুকুরটাকে, একেবারে সম্পূর্ণ শিকল কেটে ছেড়ে দিয়েচে তখন নির্লজ্জভাবে ধর্ম্মকে আপন সহায় বলে আহ্বান করেচে; মানুষ যখন বড় বড় দস্যুবৃত্তি করে পৃথিবীকে সন্ত্রস্ত করেচে তখন আপনার দেবতাকে পূজার লোভ দেখিয়ে দলপতির পদে নিয়োগ করেচে বলে কল্পনা করেচে; কৃপণ যেমন করে আপনার টাকার থলি লুকিয়ে রাখে তেমনি করে আজও আমরা আমাদের ভগবানকে আপনার সম্প্রদায়ের লোহার সিন্দুকে তালা বন্ধ করে রেখেচি বলে আরাম বোধ করি এবং মনে করি যারা আমাদের

দলের নামটুকু ধারণ না করেছে তারা ঈশ্বরের ত্যাজ্যপুত্ররূপে কল্যাণের অধিকার হতে বঞ্চিত। মানুষ ধর্ম্মের দোহাই দিয়েই এই কথা বলেচে এই সংসার বিধাতার প্রবঞ্চনা, মানবজন্মটাই পাপ, আমরা ভারবাহী বলদের মত হয় কোনো পূর্ব্ব পিতামহের নয় নিজের জন্মজন্মান্তরের পাপের বোঝা বহে নিয়ে অন্ত-হীন পথে চলেচি। ধর্ম্মের নামেই অকারণ ভয়ে মানুষ পীড়িত হয়েচে এবং অদ্ভুত মূঢ়তায় আপনাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্ধ করে রেখেচে।

কিন্তু তবু এই সমস্ত বিকৃতি ও ব্যর্থতার ভিতর দিয়েও ধর্ম্মের সত্যরূপ নিত্যরূপ ব্যক্ত হয়ে উঠ্‌চে। বিদ্রোহী মানুষ সমূলে তাকে ছেদন করবার চেষ্টা করে কেবল তার বাধা-গুলিকেই ছেদন করচে। অবশেষে এই কথা মানুষের উপলব্ধি করবার সময় এসেচে যে, অসীমের আরাধনা মনুষ্যত্বের কোনো অঙ্গের উচ্ছেদ সাধন নয়, মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ পরিণতি।

অনন্তকে একই কালে একদিকে আনন্দের দ্বারা অন্য দিকে তপস্যার দ্বারা উপলব্ধি করতে হবে ; কেবলি রসে মজে থাকতে হবে না, জ্ঞানে বুঝতে হবে, কর্ম্মে পেতে হবে ; তাকে আমার মধ্যে যেমন আনতে হবে তেমনি আমার শক্তিকে তাঁর মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। সেই অনন্তস্বরূপের সম্বন্ধে মানুষ একদিকে বলেচে আনন্দ হতেই তিনি যা-কিছু সমস্ত সৃষ্টি করচেন আবার আর একদিকে বলেচেন স তপোঽতপ্যত তিনি তপস্যাদ্বারা যা-কিছু সমস্ত সৃষ্টি করচেন। এই দুইই একই কালে সত্য। তিনি আনন্দ হতে সৃষ্টিকে উৎসারিত করচেন, তিনি তপস্যা-দ্বারা সৃষ্টিকে কালের ক্ষেত্রে প্রসারিত করে নিয়ে চলেচেন। একই কালে তাঁকে তাঁর সেই আনন্দ এবং তাঁর সেই প্রকাশের দিক থেকে গ্রহণ না করলে আমরা চাঁদ ধরচি কল্পনা করে কেবল আকাশ ধরবার চেষ্টা করব।

বহুকাল পূর্ব্বে একবার বৈরাগীর মুখে গান

শুনেছিলুম, "আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যেরে!" সে আরো গেয়েছিল, "আমার মনের মানুষ যেখানে, আমি কোন্ সন্ধানে যাই সেখানে?" তার এই গানের কথাগুলি আজ পর্য্যন্ত আমার মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচে। যখন শুনেচি তখন এই গানটিকে মনের মধ্যে কোনো স্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যা করেচি তা নয় কিম্বা এ কথা আমার জানবার প্রয়োজন বোধ হয় নি যে, যারা গাচ্চে তারা সাম্প্রদায়িক ভাবে এর ঠিক কি অর্থ বোঝে। কেন না, অনেক সময়ে দেখা যায় মানুষ সত্যভাবে যে কথাটা বলে মিথ্যাভাবে সে কথাটা বোঝে। কিন্তু একথা ঠিক যে এই গানের মধ্যে মানুষের একটি গভীর অন্তরের কথা প্রকাশ হয়ে পড়েচে। মানুষের মনের মানুষ তিনিই ত নইলে মানুষ কার জোরে মানুষ হয়ে উঠচে? ইহুদিদের পুরাণে বলেচে ঈশ্বর মানুষকে আপনার প্রতিরূপ করে গড়েচেন, স্থূল বাহ্য

ভাবে এ কথার মানে যেমনি হোক্ গভীর ভাবে এ কথা সত্য বই কি। তিনি ভিতরে থেকে আপনাকে দিয়েই ত মানুষকে তৈরি করে তুলচেন। সেই জন্যে মানুষ আপনার সব কিছুর মধ্যে আপনার চেয়ে বড় একটি কাকে অনুভব করচে। সেই জন্যেই ঐ বাউলের দলই বলেচে—"খাঁচার মধ্যে অচিন পাখী কম্‌নে আসে যায়!" আমার সমস্ত সীমার মধ্যে সীমার অতীত সেই অচেনাকে ক্ষণে ক্ষণে জানতে পারচি, সেই অসীমকেই আমার করতে পারবার জন্যে প্রাণের ব্যাকুলতা।

আমি কোথায় পাব তারে,
আমার মনের মানুষ যে রে!

অসীমের মধ্যে যে একটি ছন্দ দূর ও নিকট-রূপে আন্দোলিত, যা বিরাট হৃৎস্পন্দনের মত চৈতন্যধারাকে বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রেরণ ও সর্ব্বত্র হতে অসীমের অভিমুখে আকর্ষণ করচে, এই

গানের মধ্যে সেই ছন্দের দোলাটুকু রয়ে গেচে।

অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম অন্য জগতের অন্য জীবের সঙ্গে আপনাকে কি সম্বন্ধে বেঁধেচেন তা জানবার কোনো উপায় আমাদের নেই, কিন্তু এইটুকু মনের ভিতরে জেনেচি যে মানুষের তিনি মনের মানুষ;—তিনিই মানুষকে পাগল করে পথে বের করে দিলেন, তাকে স্থির হয়ে ঘুমিয়ে থাকতে দিলেন না। কিন্তু সেই মনের মানুষ ত আমার এই সামান্য মানুষটি নয়; তাঁকে ত কাপড় পরিয়ে, আহার করিয়ে, শয্যায় শুইয়ে, ভোগের সামগ্রী দিয়ে ভুলিয়ে রাখবার নয়। তিনি আমার মনের মানুষ বটে কিন্তু তবু দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলতে হচ্চে, "আমার মনের মানুষ কেরে, আমি কোথায় পাব তারে?" সে যে কে তা ত আপনাকে কোনো সহজ অভ্যাসের মধ্যে স্থূল রকম করে ভুলিয়ে রাখলে জানতে পারব না—তাকে জ্ঞানের সাধনায়

জানতে হবে; সে জানা কেবলি জানা, সে জানা কোনোখানে এসে বদ্ধ হবে না। "কোথায় পাব তারে?" কোনো বিশেষ নির্দ্দিষ্ট স্থানে কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্যে ত পাওয়া যাবে না,—স্বার্থবন্ধন মোচন করতে করতে মঙ্গলকে সাধন করতে করতেই তাকে পাওয়া—আপনাকে নিয়ত দানের দ্বারাই তাকে নিয়ত পাওয়া।

মানুষ এমনি করেই ত আপনার মনের মানুষের সন্ধান করচে—এমনি করেই ত তার সমস্ত দুঃসাধ্য সাধনার ভিতর দিয়েই যুগে যুগে সেই মনের মানুষ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠচে; যতই তাকে পাচ্চে, ততই বলচে, "আমি কোথায় পাব তারে?" সেই মনের মানুষকে নিয়ে মানুষের মিলন বিচ্ছেদ একাধারেই; তাঁকে পাওয়ার মধ্যেই তাঁকে না পাওয়া। সেই পাওয়া না পাওয়ার নিত্য টানেই মানুষের নব নব ঐশ্বর্য্য লাভ, জ্ঞানের অধিকারের ব্যাপ্তি,

কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসার—এক কথায় পূর্ণতার মধ্যে অবিরত আপনাকে নব নব রূপে উপলব্ধি। অসীমের সঙ্গে মিলনের মাঝখানেই এই যে একটি চিরবিরহ আছে এ বিরহ ত কেবল রসের বিরহ নয়, কেবল ভাবের দ্বারাই ত এর পূর্ণতা হতে পারে না; জ্ঞানে কর্ম্মেও এই বিরহ মানুষকে ডাক দিয়েচে, ত্যাগের পথ দিয়ে মানুষ অভিসারে চলেচে। জ্ঞানের দিকে, শক্তির দিকে, প্রেমের দিকে যে দিকেই মানুষ বলেচে আমি চিরকালের মত পৌঁছেচি, আমি পেয়ে বসে আছি, এই বলে যেখানেই সে তার উপলব্ধিকে নিশ্চলতার বন্ধন দিয়ে বাঁধতে চেয়েচে, সেইখানেই সে কেবল বন্ধনকেই পেয়েচে, সম্পদকে হারিয়েচে, সে সোনা ফেলে আঁচলে গ্রন্থি দিয়েচে। এই যে তার চিরকালের গান, "আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে?" এই প্রশ্ন যে তার চিরদিনের প্রশ্ন—"মনের মানুষ যেখানে,

বল কোন সন্ধানে যাই সেখানে?" কেন না সন্ধান এবং পেতে থাকা এক সঙ্গে; যখনি সন্ধানের অবসান তখনি উপলব্ধির বিকৃতি ও বিনাশ।

এই মনের মানুষের কথা বেদমন্ত্রে আর এক রকম করে বলা হয়েচে। তাঁকে বলেচে "পিতা নোঽসি" তুমি আমাদের পিতা হয়ে আছ। পিতা যে মানুষের সম্বন্ধ—কোনো অনন্ত তত্ত্বকে ত পিতা বলা যায় না। অসীমকে যখন পিতা বলে ডাকা হল তখন তাঁকে আপন ঘরের ডাকে ডাকা হল, এতে কি কোনো অপরাধ হল? এতে কি সত্যকে কোথাও খাটো করা হল? কিছুমাত্র না। কেননা আমার ঘর ছেড়ে তিনি ত শূন্যতার মধ্যে লুকিয়ে নেই। আমার ঘরটিকে তিনি যে সকল রকম করেই ভরেচেন। মাকে যখন মা বলেচি তখন পরম মাতাকে ডাকবার ভাষাই যে অভ্যাস করেচি—মানুষের সকল সম্বন্ধের

ভিতর দিয়েই যে তাঁর সঙ্গে আনাগোনার দরজা একটি একটি করে খোলা হয়েচে—মানুষের সকল সম্বন্ধের ভিতর দিয়েই যে আমরা এক একভাবে অসীমের স্পর্শ নিয়েচি। আমার সেই ঘরভরা অসীমকে, আমার সেই জীবনভরা অসীমকে আমার ঘরের ডাক দিয়েই ডাকতে হবে, আমার জীবনের ডাক দিয়েই ডাকতে হবে, সেইটেই আমার চরম ডাক, সেই জন্যেই আমার ঘর, সেই জন্যেই আমি মানুষ হয়ে জন্মেচি, সেই জন্যেই আমার জীবনের যত কিছু জানা, যত কিছু পাওয়া। তাই ত মানুষ এমন সাহসে সেই অনন্ত জগতের বিধাতাকে ডেকেচে "পিতা নোঽসি" তুমি আমারই পিতা, তুমি আমারই ঘরের। এ ডাক সত্য ডাক—কিন্তু এই ডাকই মানুষ একেবারে মিথ্যা করে তোলে, যখন এই ছোট অনন্তের সঙ্গে সঙ্গেই বড় অনন্তকে ডাক না দেয়। তখন তাঁকে আমরা মা বলে পিতা বলে কেবল মাত্র আবদার করি,

আর সাধনা করবার কিছু থাকে না—যে টুকু সাধনা সেও কৃত্রিম সাধনা হয়। তখন তাঁকে পিতা বলে আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করতে চাই, মকদ্দমায় ফল লাভ করতে চাই, অন্যায় করে তার শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাই। কিন্তু এ ত কেবল মাত্র নিজের সাধনাকে সহজ করবার জন্য ফাঁকি দিয়ে আপন দুর্ব্বলতাকে লালন করবার জন্যে তাঁকে পিতা বলা নয়। সেই জন্যেই বলা হয়েচে পিতা নোঽসি, পিতা নো বোধি—তুমি যে পিতা এই বোধকে আমার উদ্বোধিত করতে থাক। এ বোধ ত সহজ বোধ নয়, ঘরের কোণে এ বোধকে বেঁধে রেখে ত চুপ করে পড়ে থাকবার নয়। আমাদের বোধের বন্ধন মোচন করতে করতে এই পিতার বোধটিকে ঘর থেকে ঘরে, দেশ থেকে দেশে সমস্ত মানুষের মধ্যে নিত্য প্রসারিত করে দিতে হবে। আমাদের জ্ঞান প্রেম কর্ম্মকে বিস্তীর্ণ করে দিয়ে ডাকতে হবে,

পিতা,—সে ডাক সমস্ত অন্যায়ের উপরে বেজে উঠবে, সে ডাক মঙ্গলের দুর্গম পথে বিপদের মুখে আমাদের আহ্বান করে ধ্বনিত হবে। পিতা নো বোধি নমস্তেঽস্তু. পিতার বোধকে উদ্বোধিত কর যেন আমাদের নমস্কারকে সত্য করতে পারি, যেন আমাদের প্রতিদিনের পূজায়, আমাদের ব্যবসায়ে, সমাজের কাজে, রাজ্যের কাজে আমাদের পিতার বোধ জাগ্রত হয়ে পিতাকে নমস্কার সত্য হয়ে ওঠে। মানুষের যে পরম নমস্কারটি তার যাত্রাপথের দুইধারে তার নানা কল্যাণকীর্ত্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলেচে সেই সমগ্র মানবের সমস্তকালের চিরসাধনার নমস্কারটিকে আজ আমাদের উৎসবদেবতার চরণে নিবেদন করতে এসেচি। সে নমস্কার পরমানন্দের নমস্কার, সে নমস্কার পরম দুঃখের নমস্কার। নমঃ সম্ভবায় চ, ময়োভবায় চ, নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ, তুমি সুখরূপে আনন্দকর তোমাকে

নমস্কার, তুমি দুঃখরূপে কল্যাণকর তোমাকে নমস্কার, তুমি কল্যাণ তোমাকে নমস্কার, তুমি নব নবতর কল্যাণ তোমাকে নমস্কার।

১১ই মাঘ, ১৩২০।